উত্তরণ

রামশঙ্কর চৌধুরী

[illegible] অ্যাসোসিয়েট্‌স
[illegible] বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ : প্রথম মুদ্রণ

আষাঢ়, ১৩৭০

পূরেন্দ্রনাথ রায়. রীডার্স অ্যাসোসিয়েটস ৭৬, বৌবাজার স্ট্রীট কলিকাতা ১২. হইতে প্রকাশিত ও নির্মল সরকার কর্তৃক নিও প্রিণ্টার্স. ৭৬ বৌবাজার স্ট্রীট. কলিকাতা ১২. হইতে মুদ্রিত।

উৎসর্গ

অনুজ মিহিরকে

UTTARAN

A novel by

Ramsankar Chowdhury

॥ এক ॥

নবীনকে নবীন বেশে দেখে গ্রামের লোক অবাক হয়ে গেলো। অবাক হবারই কথা। অনেক দিন আগে নবীন ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছিল। প্রথম কয়েক মাস তার বাবা কিছুটা খোঁজা খুঁজি করে যখন সন্ধান করতে পাবেনি তখন আশা ছেড়েই দিয়েছিল। অনেকেই বলেছিল-'ও আর পাওয়া যাবেক নাই, কুনু অন্তাজের হাতে পড়েছে নবীন।'

সেই নবীন আবার ফিরে এলো, দেখে মনে হলো, হাঁ, ওস্তাদের হাতেই পড়েছিল নবীন। বেশ-বাস নূতন। মাথায় লম্বা লম্বা চুলগুলো সামনের দিকে চূড়া ক'রে বাঁধা। পরণে একটা গেরুয়া রঙের আলখাল্লা, ডান হাতে একটা একতারা, কটিদেশে একটা ডুগি।

নবীন এসে উঠেছিল গ্রামের গ্রাম্য দেবতার ভোগ রাঁধবার ঘরে। গ্রাম্য দেবতার কোনো মন্দির নেই। একটা গাছের তলায় সারি সারি কয়েকটা পাথরের খোদাই করা মূর্তি। কোন্ এক অতীত যুগের ভাস্কর্যের নিদর্শন। মূর্তিগুলি অধিকাংশই মহাবীরের, একটি বুদ্ধ মূর্তিও আছে। প্রত্যেকটি মূর্তিই দ্বিধা বিভক্ত। এখানের লোকের মুখে শুনা যায়, নাকি বর্গীরা এসে কিছু না পেয়ে ওই মূর্তিগুলির দেহের উপরই তাদের শক্তিমত্তার পরিচয় রেখে দিয়ে গেছে। এই কিংবদন্তি আজো চলে আসছে, কেউ যাচাই ক'রে দেখেনি এর মূলে কতোখানি সত্য নিহিত আছে। কোনো ইতিহাসেব ছাত্রও কোনো দিন ঔৎসুক্য প্রকাশ করেনি। তারপর কোন্ সময় হতে এই মূর্তিগুলি গ্রাম্যদেবতার আসন অধিকার ক'রে বসে ছিলো, তারও কোনো প্রামাণ্য সূত্র নেই। তা যাই হোক, সুদূর অতীত থেকে এগুলিকে দেবতাজ্ঞানেই পূজো করে সবাই। বিপদে আপদে জুড়ি দেয়, চাষের দিনে আকাশে মেঘাগম না হলে, গ্রাম্য দেবতাকে স্নান করায়। গ্রামে মহামারী দেখা দিলে গ্রাম্য দেবতা নাকি খড়ম পায়ে ঘুরে বেড়ান নিশুতি রাতে। সে খড়মের শব্দ অনেকেই নাকি শুনেছে। এ হেন দেবতারই ভোগ

রাঁধবার জন্য একটা দু'চালা আছে। কোনো সাধু-সন্ন্যাসী গ্রামে গ্রামে এলে এখানেই আশ্রয় নেয়। উনোন আছে, রান্না করে। যে কয়দিন ইচ্ছা থেকে, চলে যায়।

নবীনও উঠেছিল ওই ঘরটাতেই।

দেখতে এসেছিল অনেকেই। ছেলে, যোয়ান, বুড়ো। তাদের চোখে বিস্ময়ের ভাব। মেয়েরাও এসেছিল। পুকুরে জল আনতে যাবার সময় বৌ-ঝিয়েরাও ঘোমটার ফাঁকে উঁকি মেরে দেখেছিল। বিকেলের দিকে রীতিমত একটা জনতা জমে উঠলো। জনতার মধ্য থেকেই একজন বললো,—এতকাল পরে তবে তুর গাঁ-কে মনে পড়লো নবীন। নবীন শুধু একটু হাসলো প্রশ্নকর্তার মুখের পানে তাকিয়ে। একজন বর্ষিয়সী নবীনকে দেখে চোখের জল মুছলো, হায় হায়, কি ছেলে কি হয়ে গেছে। দুটো বছর আগে এলেও বাপ-মাকে দেখতে পেত নবীন। বড়ো মনোবেদনা পেয়ে মরেছে কানু। বলতে গেলে নবীনের জন্য কেঁদে কেঁদেই জীবনটা গেছে তার।—আলিই যখন বাছা, তখন দুটা বছর আগে আলি নাই ক্যানে? বাপ্-মাকে ত দেখতে পাতিস। এ-কথাতেই একটু হাসলো নবীন।

মা-বাপ্ হারানোর মত ঘটনা তো অতি স্বাভাবিক। নির্মম সত্য। প্রাকৃতিক নিয়ম অনুযায়ী এই পৃথিবীতে মানুষ জন্মাবে, মরবে। আবার জন্ম হবে, আবার মৃত্যু। জীবন মৃত্যুরই তো খেলা। এর মধ্যে দুঃখ করবার কী-ই বা আছে? কিছু নেই। তবে যতদিন মানুষ বেঁচে থাকবে —সেই কটা দিন তাকে সুখী করে বাঁচিয়ে রাখাই কর্তব্য। ধর্ম।

নবীনের মুখে হাসি দেখে কেউ কেউ বিরক্ত হলো। ছোকরাদের মধ্যে কে একজন বললো, ও বাউল হুঁয়্যাছে যে! সাধু হুঁয়্যাছে! এ মন্তব্যের বিরোধিতা করবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলো না নবীন। সাধু সন্ত সে হ'তে চায় বৈ কী, কিন্তু পারে কৈ? এখনো তার কামনা রয়েছে কামনা বাসনাকে বিসর্জন না দিতে প্যারলে তো সন্ত হওয়া যায় না। একপক্ষের আলোচনা আর কতক্ষণ চলতে পারে, তাই জোগান না পেয়ে নিরুৎসাহ হয়ে অনেকে বাড়ীই ফিরে গেলো, থাকল শুধু ধর্মদাস।

ধর্মদাস জাতিতে মুচি। নবীনদের সঙ্গে তার রক্তের সম্পর্ক নেই। নবীনের বাপের সঙ্গে ছিল আত্মীয়তা। এ আত্মীয়তা আবার গড়ে উঠেছিল ওর শৈল্পিক জীবনকে কেন্দ্র ক'রে। কিশোরীর একটা সম্প্রদায় ছিল। ধর্মদাস ছিল সেই সম্প্রদায়ের ঢোলকদার। ঢোলে টিকরা কেউ বাজাতে পারত না ধর্মদাসের মত। হাতটিও ছিল খুব মিঠা। এইজন্য নবীনের কাছে ধর্মদাসের সমাদর ছিল। কিশোরী বলত, তুর ঢোলে কাঠি পড়লেই সানাই-এর স্বুর আপনা হতেই বিরাএ আসে ধম্মদাস। ধর্মদাস উত্তরে বলত, আর তুর সানাইয়ে রাগ-রাগিণী আমাকে টান্যা লিয়ে যায় কিশোরী। সত্যই রাঢ়ের এই অঞ্চলে কিশোরী ডোমের নাম খ্যাতি দুই-ই ছিল। সাধনা করেছিল কিশোরী। কিশোরী দরদ দিয়ে যখন রাগ-রাগিণী আলাপ করত, তখন মনে হ'তো রাগ-রাগিণী ওর নির্দেশে মূর্তিমতী হয়ে খেলা করছে।

ডাক আসত কিশোরীর। বড়ো বড়ো ডাক। বড়ো ঘর, বড়ো বায়না। নদীর ওপার থেকে লোক এসে বসে থাকত কিশোরীকে নিয়ে যাবার জন্য। কিশোরীর সঙ্গে বহু জায়গায় ঘুরেছে ধর্মদাস। তখন নবীন হয়নি। কিশোরীর সঙ্গে থেকে থেকে একটা আত্মীয়তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ওদের মধ্যে। আজ নবীনকে এই বেশে দেখে ধর্মদাসের মনে পুরোনো দিনের অনেক কথাই যাওয়া আসা করতে লাগলো।

জনতা একটু পাতলা হলে ধর্মদাস এগিয়ে এসে বললো, "আমি তুর ধম্মদাস কাকারে লবীন, চিনতে পারছিস ?"

যে কয়বছর নবীন গ্রাম ছেড়ে চলে গিয়েছিল, সেই কয় বছরের মধ্যে কি পরিবর্তনই না হয়ে গেছে গ্রামটার। বাবা-মা স্বর্গে গেছেন, কিশোরীর কোঠাবাড়ীটা মানুষ জনের অভাবে পড়ে গেছে। বাউরী পাড়ার একটা কুলিই একেবারে শূন্য হয়ে গেছে। গ্রামে ঢুকবার মুখেই একটা দু'তালা পাকা বাড়ী উঠেছে। কার তা জানে না। শহরের সঙ্গে গ্রামটার যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে বাস সার্ভিসের মাধ্যমে। গ্রামে কিছু কিছু ভদ্রলোকও দেখেছে। দারোগা সাহেব ছাড়া ইংরাজী জানা লোক কেউ আগে থাকত না—এখন আরও কয়েকজন প্যাণ্ট

পরা বাবুকে ঘুরতে দেখেছে রাস্তায়। এই পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে ধর্মদাসও বয়সের সিঁড়িগুলি অতিক্রম করে এসে বার্দ্ধক্যের দরজায় উপস্থিত হয়েছে। প্রথম দেখলে চেনা মুস্কিল।

নবীন বললো, চিনেছি কাকা।

ধর্মদাস খুশি হলো। বললো, তা যখন আমি বাঁচ্যা আছি তখন আমার ঘরকেই চল লবীন।

নবীন বললো, একটা কি দুটা রাত আমি থাকব, এই ঠ্যানেই বেশ কেটে যাবে।

—তাই কি হয় রে! ইঠ্যানে কি কেউ থাকতে পারে! চল, লে উঠ।

নবীনকে নিয়ে এলো ধর্মদাস। বাইরের দিকে একটা ঘর ছিল ধর্মদাসের। সেই ঘরে তুললো নবীনকে। —ছিলা (ছেলে) ত আর নাই, বিটির বিহা দিয়্যা জামাইকেই ঘরে রাখ্যাছি। দিয়্যাছি কিছু হিতোর-পাতি কিনে, জাত ব্যবসা করে। বরাৎ পেলে দু চার জোড়া জুতা তৈরী করে, আমিও থাকি সঙ্গে সাথে, ঢোল তবলা তৈরী করি, জামাই বিক্রী করে আসে শহর বাজারে।

—তা আমি থাকলে তুমাদের কাজের—

—না রে না, কিছু ক্ষতি হবেক নাই। আমি ভৈরবীকে পাঠাঞ দি—পরিষ্কার করে দিয়ে যাক ঘরটা।

তাই হলো। ধর্মদাসের মেয়ে ভৈরবী গোবর দিয়ে নিকিয়ে দিয়ে গেল ঘরটা। তারপর ভিতর থেকে একটা খাটিয়া এনে পেতে দিয়ে বললো, কি গো লবীন দাদা, একেবারে যে কিষ্ট ঠাকুরটি সাজে আস্যাছ গো! ভৈরবীর দিকে একবার তাকালো নবীন। কি একটা কথা বলতে যাচ্ছিল নবীন, কিন্তু তাকে সে সুযোগ না দিয়ে ভৈরবী বললো, দাঁড়াও আসি। বলেই ক্ষিপ্রগতিতে চলে গেল ভৈরবী। ওকে ভালো করে দেখবার অবসর পর্যন্ত দিল না। জিনিসপত্র বলতে কিছুই ছিলনা নবীনের। একটা ঝুলিতে কয়েকটা গেরুয়া রঙে ছোপানো মার্কিনের টুকরো, কয়েকটা ম্যাজরাফ আর একটা না দুটো বই। ঝুলিটি এক পাশে রেখে, একতারাটি দেয়ালের উপর একটা পেরেক ঝুলিয়ে দিয়ে খাটিয়ায় বসলো নবীন।

ভৈরবী একটা গ্লাস হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকেই বললো, তা যে যাই বলুক, কিষ্ট ঠাকুরটি মানাইছে তুমাকে।

—ছিঃ ছিঃ! ই কথা বললে পাপ হয় যে! যুক্ত করে ঠাকুরের উদ্দেশ্যে প্রণাম করলো নবীন। হেসে উঠলো ভৈরবী। —ঠাকুর হৈতে এত ডর লাগছে নাকি? কিন্তুক কিষ্ট ত তুমি সাজতে গো। সেই যে কিষ্ট সাজে ভিখ্ করতে?

কথাটা মিথ্যা নয়।

জম জমাট অবস্থা কিশোরীর, আশে পাশের কোনো উৎসবই কিশোরীকে বাদ দিয়ে হবার উপায় ছিলনা। কিশোরীর সানাই-এর রাগ-রাগিণীর সুরমূর্চ্ছনা যখন ছোট বড়ো সকল মানুষকেই নিয়ে এসেছিল টেনে, ঠিক সেই সময়েই কিশোরী গিয়ে ভিড়ল চরণ দাসের কীর্তনের দলে। রাগ-রাগিণী থেকে নাকি হরিনাম সংকীর্তন ভালো, ভগবানের নাম গান, যে সম্পদ ভগবান দিয়েছেন, সেই সম্পদকে ভগবানের চরণে নিবেদন করাই হলো মনুষ্যধর্ম। নানান তত্ত্বকথা বুঝিয়েছিল চরণ দাস, মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল কিশোরী। কণ্ঠস্বর ভাল ছিল কিশোরীর। নিজে হারমোনিয়ম বাজাতেও জানত। চরণ দাসের দলে হারমোনিয়ম বাজিয়ে দোয়ারী করত কিশোরী। বেদনা পেয়েছিল ধর্মদাস। বলেছিল, দলটা তবে ভাঙেই দিলি কিশোরী?

—হঁ রে, উ কৈরে আর মন ভরেনা।

—মন যা চায় তাই করবি নাকি?

—আমরা ত মনেরই দাস ধম্মদাস।

কথাটা ভালো লাগেনি ধর্মদাসের। সে একটু উষ্মা প্রকাশ করেই বলেছিল, এতগুলি লোকের ভাত মারা গেল ত! কিশোরীর সম্প্রদায়ে ছিল জন দশেক মানুষ। দু'জন ঢোল বাজাত, একজন কাঁশি, একজন সানাই-এ সুর রাখত, কিশোরী বাজাত সানাই। বাকী যারা থাকল, তাদের মধ্যে কেউ রান্না করত, হাত বদলি করে ঢোল বাজাত।

—এতগুলি লোকের ভাত মারা গেল ত! বলেছিল ধর্মদাস।

কিশোরী বৈষ্ণবীয় রীতি অনুসরণ ক'রে উত্তর দিয়েছিল—ভাত কে কার মারতে পারে ধম্মদাস?

বছর পাঁচ চরণ দাসের দলে ঘুরেছিল কিশোরী, তারপর নিজেই একটা কৃষ্ণযাত্রার দল খুলেছিল। তখন নবীনের বয়স চৌদ্দ-পনেরো। গ্রামের পাঠশালায় ভর্তি করে দিয়েছিল ছেলেকে। একটু জ্ঞান হোক নবীনের, তারপর তাকে সমস্ত শিখিয়ে দিয়ে বিদায় নিবে কিশোরী। বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাস করলেও কিশোরী তাকে যাত্রার দলে ভর্তি করে নিয়েছিল। না নিয়ে উপায় ছিলনা। নবীন না হলে কিষ্ট সাজবে কে? কিশোরী গোপিনীর পোষাক পরে আসরে এসে বসত,- নবীন সাজত কৃষ্ণ।

আজো সে সব দিনের কথা মনে আছে নবীনের। তিলুড়ীর রায় বাবুরা ছিলেন ধনী মানুষ। বিরাট সম্পত্তি, রাজপ্রাসাদের মত দালান বাড়ী। কিন্তু হলে কি হয়,—সন্তান ছিলনা। বড়বাবুর দুঃখও ছিলনা এরজন্য। টাকা যা আছে—সম্পত্তি যা করেছেন তা দেবসেবায় লাগিয়ে দিয়ে পুণ্য সঞ্চয় করবেন। বড়মা অর্থাৎ বড়বাবুর সহধর্মিনী বল্লেন, সেই ভালো। বাড়ীতে দুর্গাপূজা প্রতিবৎসরই হতো— এবার শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করবেন।

তাই হলো। বিষ্টুপুর থেকে এলো কারিগর, মধ্যিহীড়ের প্রকাণ্ড মাঠটায় সৃষ্টি হলো ইট তৈরীর ভাটা। কয়েক মাস ধরে সমানে খাটল শ-পাঁচেক লোক। ইট হলো; সিমেন্ট, চুণ, সুরকি, ছাদ পেটাবার জন্য ঝোলা গুড় মণ মণ কেনা হলো। বিরাট নয় চূড়া বিশিষ্ট মন্দির হতে সময় লাগলো বছর তিন। মন্দির তৈরী হওয়ার পর কাশীধাম থেকে নিয়ে আসা হলো কালো চিকণ পাথরের কয়েক মণ ওজনের একটি শিবলিঙ্গ, আর তার সঙ্গে একটি শ্বেত পাথরের বৃষভ। ভাটপাড়া কাশীধাম থেকে এলেন পণ্ডিতরা। হোম হলো,— উৎসব হলো—সেই উৎসবে কিশোরীর যাত্রার দলের বায়নাও হয়েছিল। গিয়েছিল কিশোরী। কী যেন একটা পালা হচ্ছিল। নবীন সেজেছিল কৃষ্ণ, আর কিশোরী যশোদা। শিশু কৃষ্ণ মা যশোদার লুকিয়ে রাখা ক্ষীর ননী চুরি করে খেয়েছে। মা যশোদা ছেলেকে ধরবার জন্য পিছনে পিছনে ছুটছেন, কিন্তু কিছুতেই ধরতে পারছেন না, যতই ধরতে যান,

ততই পালিয়ে যায় কৃষ্ণ ! এতো বড়ো মুস্কিল ! কিছুতেই কি ধরা দিবিনা গোপাল ? যশোদা গান গেয়ে বললেন,—

একবার তেমনি তেমনি তেমনি ক'রে
নাচরে চাঁদের কণা ।
ও তোর মুরুলী বাঁধিয়ে দিব রে
যত লাগে সোনা ॥

মুরলী সোনায় বাঁধানোর প্রলোভনে বালক কৃষ্ণ সব ভুলে গিয়ে ছু'হাত তুলে নাচলেন। বিভোর হয়ে সে দৃশ্য দেখলো সবাই। আনন্দে করতালি দিয়ে উঠল দর্শকবৃন্দ। বড়বাবু একটা রূপোর মেডেল পরিয়ে দিলেন নবীনের গলায়। যাত্রা ভাঙলে কিশোরীকে ডেকে বলেছিলেন, তোর এই ছেলে মানুষ হবে কিশোরী। তোর মুখ উজ্জ্বল করবে।

পরদিন সকালেই এলো ধর্মদাস।

—কি বাবাজী, কাল রাতে ঘুম হ'য়্যাছিল ত ?

—ঘুম আমাদের সাধা খুড়া। যেখানেই পড়ি সেইখানেই নিদ্রা এসে জড়িয়ে ধরেন।

ধর্মদাস মাটির উপর বসবার উদ্যোগ করতেই নবীন ওকে টেনে এনে বসালো খাটিয়ার উপর।

—আমি বসে থাকব খাটে, আর তুমি মাটিতে, তাই কি হয় ! ধর্মদাস খুশিই হলো নবীনের ব্যবহারে। নবীন তাকে সম্মান করেছে, খাতির করেছে।

—বুঝলে খুড়া, মানুষ সবাই সমান। ওই যে চণ্ডীদাস ঠাকুর গো, কি বলেছেন ? বলেছেন—সবার উপরে মানুষ সত্য ! আর কিছু সত্য নাই খুড়া। ভগবানও ত মানুষ।

ধর্মদাস এ সব কথা বুঝলো না। সে বিষয়ী লোক, বিষয় নেই, কিন্তু বিষয় সংক্রান্ত জ্ঞান গম্যি তার আছে। নিজের স্বার্থজ্ঞান আছে। সামান্য চাষ নিজের হালে করে। অন্যের জমি ভাগে নেয়, জাত ব্যবসায়ে সংসার চলে না—নইলে কাজ জানে ধর্মদাস। এ অঞ্চলে চামড়ার কাজ তার মত কেউ জানে না। শহরের মিস্ত্রীদেরও তার কাছে শিখতে হয়। কিন্তু হলে কি হয়, গুণের কি আর আদর আছে

আজ কাল। কিশোরীর দল ভেঙে যাওয়ার পর কিছু দিন শহরের একটা দোকানে ঠিকে মজুরীতে একটা কাজ জুটেছিল, কিন্তু তাতে পেট ভরত কই, তাই ছেড়ে দিয়ে এসে চাষবাসেই মন দিয়েছে। —কথাটা ভালোই বলেছ লবীন। ই যুগে কি আর উ কথা কেউ শুনেরে বাবা! দেখছি তো, চোখের ছামুতে না খাত্যো পাঁয়্যা, সিরিফ উপাস দিয়ে মরে গেল গোকুল। আমাদের দলেই ছিল—তুইও দেখেছিস, পাৎলা লিক্‌লিকে চেহারা—সেই যে কিশোরীর বাঁয়ে বাজাত। দড়ি দড়ি হুয়্যা মরে গেল বেচারা, কই কেউ ত দুটি খাত্যাও দিলেক নাই উয়াকে —তবে আর মানুষ বড়ো হৈল কিসে ?

গোকুলকে মনে আছে তার, তার মৃত্যু সংবাদ সত্যিই বেদনাদায়ক— তারপর যেমনভাবে প্রতিদিন একটু একটু করে মরণ যন্ত্রণা ভোগ ক'রে সে মরেছে, তা আবো বেদনাদায়ক। মরণের যন্ত্রণা আছে, কিন্তু সব থেকে যন্ত্রণাদায়ক মরণ বোধ হয় উপবাসজনিত মৃত্যু। গোকুলের জন্য মনটা খারাপ হয়ে গেল নবীনের। তার বাবা কিশোরীর যাত্রা দলে গোকুল তবলা বাজাত। আঙুলগুলো ছিল দীর্ঘ, তবলার বাণ্ডি তার আঙুলের খেলায় মায়া সৃষ্টি করত। মাঝে মাঝে লোকজন না থাকলে দ্বারীর অভিনয় করতে হতো তাকে। দ্বারীর অভিনয় সুন্দর করত গোকুল। লোককে হাসাতে পারত খুব। আজো গোকুলের অভিনয় মনে আছে তার।

সেবার দল গিয়েছিল নদী পারের একটি গ্রামে। বাসন্তী পূজা উপলক্ষ্যে যাত্রা হবে। মাথুর গাইতে হবে। কিশোরী বলেছিল, তাই গাইব বাবু। আপনারা যা হুকুম করবেন—মান, মাথুর, প্রভাস যজ্ঞ, যযাতীর উপাখ্যান, যা বলবেন।

এই মাথুর পালাতেই গোকুল অভিনয় করেছিল মথুরার রাজা শ্রীকৃষ্ণের দ্বারীর। মাথায় পরেছিল একটা বৃহৎ পাগড়ী, গায়ে জড়ির পোষাক, কোমরে একটা ছাপা শাড়ী বেড় দিয়ে বাঁধা, শাড়ীর বেড়ের মধ্যে আটকা একটা খাপ বিহীন তরোয়াল। চেহারাটাকে ভারিক্কি দেখাবার জন্য বড়ো বড়ো গোঁফ নিয়েছিল গোকুল। ওকে দেখেই তো দর্শকরা এক ধমক হেসে নিয়েছিল। শ্রোতাদের হাসি শুনে গোকুল

যুক্তকরে বলেছিল, —হাসবেন না কেউ, এ রাজ্যে হাসির উপর আইন জারি হয়েছে।

গোকুলের প্রথম বক্তৃতা শুনে আরো এক ধমক হাসি ছড়িয়ে পড়েছিল। ঠিক এমনি সময়েই প্রবেশ করেছিল বৃন্দা। বৃন্দা সুর করে দ্বারীর মনোযোগ আকর্ষণ করবার জন্য বলেছিল—দ্বারী রে—

দ্বারীও সেই সুরেই উত্তর দিয়েছিল, মাই গো—

—দ্বারী, আমি তোদের রাজার সঙ্গে দেখা করব বলে বৃন্দাবনের রাণীর কাছ থেকে এসেছি রে—

—তবে আবার সেই রাণীর কাছেই ফিরে যাও মাই।

—কিন্তু আমাকে দেখা করতেই হবে। পথ ছাড় দ্বারী!

—রাজার বিনা হুকুমে কারো ভিতরে যাবার অধিকার নেই।

দ্বারীকে প্রলুব্ধ করবার জন্য বৃন্দা বলেছিল, এ কাজটি করে দিলে আমি তোকে কানমতি দিব দ্বারী।

এ-কথা শুনে ক্ষেপে উঠেছিল দ্বারী। চোখ পাকিয়ে কোমর থেকে তরোয়াল বের করে দ্বারী বলেছিল, কি বললি, কানে মুতি দিবি? আমার কানে মুতি দিবি?

দ্বারীর উত্তর শুনে সবাই হেসে গড়াগড়ি গিয়েছিল। সেই গোকুল মরে গেছে।

—গোকুল খুড়া তো ই গাঁয়ে থাকত নাই খুড়া! জিজ্ঞেস করলো নবীন।

—ই গাঁয়ে থাকবেক কুথায়? কিছু কি আর ছিল তার। তোর বাপ যাত্রার দল তুলে দিতেই সেও গাঁ ছাড়্যা চলে গেইছিল।

আরো হয়ত গোকুল সম্বন্ধেই কিছু বলতে যাচ্ছিল ধর্মদাস, ঠিক সেই সময়েই ভৈরবী এসে উপস্থিত হলো। অনেকটা বেলা হয়ে গিয়েছিল। এরই মধ্যে ভৈরবী চুলটা আঁচড়ে নিয়েছে। কপালের মধ্যিখানে গোল করে পরেছে একটা টিপ্। ভৈরবী একবার আড়চোখে নবীনকে দেখে নিয়ে বাপকে বললো, শুড়িরা আস্যাছে যে!

ধর্মদাস রেগে গিয়ে বললো, বলেছি তো ওই টুকুন জমি আমি দিব নাই।

—তাই পষ্ট করে বলে দাওগা যাও। বললো ভৈরবী।

—দু দণ্ড বসে যে কথা কইব তার উপায় নাই। গজ গজ করতে করতে চলে গেল ধর্মদাস। ওর যাওয়া দেখে হেসে উঠলো ভৈরবী। হাসলে অদ্ভুত সুন্দর দেখায় ভৈরবীকে। কুল ফুলের মত একরাশ সাদা ধবধবে দাঁত মুখের গহ্বর থেকে উঁকি মারে—ঠিক মেঘে ঢাকা তারার মত। স্থান কাল ভুলে গিয়ে নবীন তাকিয়েছিল ভৈরবীর পানে। ভৈরবী হাসতে হাসতেই জিজ্ঞেস করলো, কি দেখছ কিষ্ট ঠাকুর ?

অপ্রস্তুত হ'য়ে গেলো নবীন। তাইত, সে একি করছে! সে বললো, কই কিছুই না ত !

—উ কথা কইলে কি আমি শুনি ঠাকুর ? ভগমান আমাকেও দুটা চোখ দিয়েছে যে! বলনা, বলতে লাজ কিসের ?

আবার হেসে উঠলো ভৈরবী।

এই হাসিতে যোগ দিয়ে নবীন বললো, লাজ কি আর আমাদের আছে।

এবার যেন ভৈরবীই লজ্জা পেলো। পিঠে পড়ে থাকা খোলা চুলগুলি সামনের দিকে এনে, তাই টানতে টানতে বললো, লাজ হারাবার জন্যই দেশ ঘর ছাড়্যা বাউল হুয়্যাছ বুঝি ? কিন্তু কই, গায়েন তো শুনালে নাই !

—শুনাব কাকে ?

—ওমা সে কী কথা, এত লোক রইছে আর তুমি লোক খুঁজে পাছ নাই ?

—সবাই কি আর গান শুনে।

—তবে গায়েন শুনার লোক আলাদা হয়। তাই না হয় আমাদেরই শুনাও।

—তোমাদের মানে তোমাকে ?

এমনি সময়েই নন্দদুলাল ঘরে ঢুকতেই ভৈরবী পিঠের উপর পড়ে থাকা আঁচলটা টেনে মাথায় দিল। ভৈরবী নন্দকে উদ্দেশ ক'রে বললো, বলি মরদ লোক গলা খাকারী দিয়ে আসতে হয়না ?

নন্দদুলাল কোনো জবাব দিলনা। নন্দ এসেছিল তার একটা

"হেত্তার" নিতে। এক জোড়া জুতোর বরাত পেয়েছে থানার একজন কনেষ্টবলের কাছে। জুতোটা ফর্মায় লাগানো আছে—আজ ডেলিভারী দিয়ে নিয়ে আসবে টাকাটা। সে কারো দিকে না তাকিয়ে ফর্মা জোড়াটা নিয়ে বেরিয়ে গেল।

নবীন ভৈরবীকে জিজ্ঞেস করলো, ওই বুঝি তোমার বর?

—তা না হলে আর মাথায় কাপড় দিব ক্যানে?

—তুমি আলাপ করাই দিলে নাই যে!

—আপনিই হবেক। কিন্তু কই গায়েন শুনাবে বললে যে—

—বেশ শুন।

নবীন একতারাটা পেড়ে নিয়ে এলো দেয়াল থেকে। তারের সুরের সঙ্গে সুর মিলিয়ে গাইলো—

"কদম তলায় দাঁড়িয়ে বাঁকা কে বটে
ও তার কর্ণে কুণ্ডল, করে ঝলমল
অলক তিলক ললাটে॥
লাল টুক্‌টুকে পা দুখানি
তায় নুপুর পরা
বাজে রুনুর রুনুর
ঝুনুর ঝুনুর
প্রাণ মনোহরা
ও তার গলায় দোলে বনমালা
পীতবাস কটি তটে॥

—ওলো, ও ভৈরবী, বলি এইটা কি গায়েন শুনবার সময় লো।

ভৈরবীর মা উঠানে গোবর দিচ্ছিল, গানের সুর কানে যেতেই কাজটাকে অসমাপ্ত রেখে দিয়ে চলে এসে দরজায় দাঁড়ালো, হাতে তখনো তার গোবর লেগে রয়েছে। ভৈরবীর মায়ের মুখখানা দেখলে মনে হয় মনের ভিতর কিসের একটা আগুন জ্বলছে। ও আসাতেই গান বন্ধ করলো নবীন।

ভৈরবী মায়ের কথার উত্তরে বললো, আমার কাজ তো আমি সারে দিয়ে আসেছি।

চাষের আয় থেকে সংসার চলে না ধর্মদাসের, চলবার কথাও নয়, তাই ঘরে একটা গরু রেখেছে সে। দুধ বিক্রী করে। 'রোজ' আছে দুটো। থানায় এক পোয়া দিতে হয়, আর এক পোয়া দেয় সরকারী একটি বাবু এসেছেন—বলক অফিসর না কি, তাকে। ভোরেই দিয়ে আসতে হয়। এই কাজটিই ভৈরবীর।

—আর সংসারে কিছু কাজ নাই নাকি ? মা বুড়ী গোবর দেক্, গুয়াল ফেলুক, আর আহ্লাদী বিটি বসে বসে গান শুনুক।

—বেশ বকতে হবেক নাই, চল কি করতে হবেক, বাবারে বাবা !

উঠে চলে গেলো ভৈরবী। পিছনে পিছনে তার মাও চলে গেলো।

নবীনের ঘরটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার দায়িত্ব নিজেই নিয়েছে ভৈরবী। সকালে এক বালতি গোবর গুলে নিকিয়ে দিয়ে যায়। প্রত্যহ গোবর না দিলে ধুলো জমে ওঠে। তারপর তার মা যখন পুকুরে যায় তখন ঝাঁট দিয়ে যায় ভৈরবী।

আপত্তি করে নবীন। সেদিন বললো, তার চেয়ে বরং একটা ঝাঁটা দিয়ে যেও।

—আমাকে ঝেঁটিয়ে দূর করবার তরে নাকি গো ঠাকুর! মুখ টিপে হাসি গোপন করে বললো ভৈরবী।

—ছিঃ ছিঃ ই কি কথা কইছ। ঘর ত তুমাদেরই, আমিই বরং—

—থাক্ থাক্, গান গাওয়া আর ঝাঁট দেওয়া, গোবর দেওয়া এক কাজ লয়। যার গয়না তাকেই সাজে।

—না বলছি, তুমার আবার ঘরের কাজ আছে তো !

—তা থাক্, কিন্তু ঠাকুর, ই ঘর পরিষ্কার করে রাখবার আক্কেল তুমার নাই। এক মাস যদি ঘরে ঝাঁট না পড়ে তবে তুমি সেই ধুলো কাদার মধ্যেই থাকবে। বাপরে বাপ। কি 'গৈড়া' (অলস) মানুষ, এমন দুটি দেখি নাই। কাজ করতে করতেই বলে ভৈরবী।

—তুমার মতনই কি দেখেছি ?

একটুখানি হাসি ভৈরবীর ঠোঁটের প্রান্ত ছুঁয়ে মিলিয়ে গেল। হাতের কাজ সমাধা হলে বালতিটা তুলে নিয়ে ভৈরবী বললো, চলি হে ঠাকুর!

—বসই না একটু। বললো নবীন।

—বাবারে বাবা, বসবার কি উপায় আছে ? ওঁর আবার রাগ হয়, হি হি হি—, তীব্র বেগে মাথাটার সঙ্গে দেহটা ঘুরিয়ে নিয়ে চলে গেল ভৈরবী।

একটুক্ষণের জন্য মনে হ'ল ঘরটা থেকে যেন এক রাশ আনন্দ গেলো বেরিয়ে। ভৈরবী যতক্ষণ কাছে কাছে থাকে ততক্ষণ এ পৃথিবীকে অন্য রকম মনে হয় নবীনের। এ পৃথিবীতে বোধ হয় আনন্দ আছে। আপনার অজ্ঞাতেই এই আনন্দটুকুর জন্য এ গ্রাম ছাড়তে চায় না নবীন। মনে হয় "আরো একটু পেয়ে নি", আরো একটু নিয়ে নিই। বিচার করে দেখে নি এ কাজ ভাল কি মন্দ। হৃদয়ের একটা স্বাভাবিক আবেগই তাকে বেঁধে রেখেছিল এই ঘরটার চারিপাশে। ভৈরবীর এখন আর ফিরবার আশা নেই, কাজেই উঠে পড়লো নবীন। একবার তার বাবার ভিটেটা দেখে আসবে।

সেই দিকেই গেল নবীন। বাউরী পাড়ার যে অংশে ধর্মদাস মুচির ঘর, তা থেকে আরো খানিকটা উত্তরে এগিয়ে গেলেই গ্রামের সদর রাস্তা—ঠিক রাস্তা নয়, সড়ক। শহর থেকে এসেছে। এই পথ দিয়ে শহর থেকে বাস আসে, জীপ গাড়ীতে চড়ে সরকারী সাহেবরা যাওয়া আসা করেন। গরুর গাড়ী বোঝাই করে পাশের গ্রামের কুমোররা মাটির হাঁড়ি কলসি বিক্রী করতে যায় হাটে হাটে। এক এক সঙ্গে চার পাঁচটা গাড়ী যায়। এদের গাড়ীগুলি রাত্রিতেই চলে। ঠিক সকালেই হাটে গিয়ে পৌছাবার জন্যই এই ব্যবস্থা। কিশোরীর ঘরটা ছিল রাস্তার ধারেই। মাটির কোঠা ঘর। ভিতর দিকে উঠান। উঠানের শেষ একটা পড়ে থাকা বিঘা খানিক জমি। উঠান থেকে পিছনের বাড়ীতে যাবার জন্য একটা ছোট দরজা ছিল। কিশোরীর ঘর থেকেই থানাটা দেখতে পাওয়া যায়। উঁচু জায়গার উপর থানা অবস্থিত। নবীন ঘুরে ঘুরে দেখছিল আপনাদের বাস্তু ভিটাটা। মাটিটা খুব শক্ত—পাথুরে মাটি, তাই কোনো কোনো স্থানে এখনো দাঁড়িয়ে আছে দেয়ালগুলো। ঠিক চিনতে পারে নবীন, ডান পাশে একটা ছিল ছোট চালাঘর, সেই চালা ঘরের মাটির উপরই ভূমিষ্ঠ হয়েছিল নবীন। মাটির উপর শ্রদ্ধায় মাথাটা তার নুয়ে এল। ওই

স্থানের খানিকটা মাটি নিয়ে গায়ে মাথায় মাখলো নবীন। সহসা চোখ দুটো তার সজল হয়ে উঠল। অনেক দিন পর মা-বাবাকে মনে পড়ল তার।

—এই যে লবীন, ঠিক ধরেছিলুম, ওরে হাজার হোক—জন্মস্থান! চমকে উঠলো নবীন। পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখলো ধর্মদাস দাঁড়িয়ে আছে একটু উঁচু জায়গায়। আস্তে আস্তে এগিয়ে এলো নবীন। ধর্মদাস আপন মনেই বললো, আরে বাউলই হও, আর বাউণ্ডুলাই হও, বাপ মায়ের ভিটাকে কি কেউ ভুলতে পারে? এ সব কথার কোনো জবাব না দিয়ে নবীন বললো, আমাকে কিছু বলছিলে খুড়া?

—হাঁ বলছিলেন, তবে আমি লই, বলক বাবু!

সে আবার কে? কোনো দিন তাকে দেখেছে বলে মনে পড়েনা, এবং তার সঙ্গে নবীনের যে কোনো কাজ থাকতে পারে তাও ভাবেনি, তাই জিজ্ঞেস করলো, বলক্ বাবু কে খুড়া? আমাদের কেউ হয় নাকি?

—নারে বলক্ বাবু—বলক্ বাবু, পাঠশাল করেন, রাস্তাঘাট দেখেন, রিলিফ দেন, সে অনেক। তুর সঙ্গে আলাপ করতে চান।

—আমার সঙ্গে?

—হঁ রে। তুই আস্যাছিস শুনে আমার কাছে লোক পাঠাইছিলেন, যাতে আমি তোকে নিয়ে যাই।

কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা না করে নবীন ধর্মদাসকে অনুসরণ করলো। রাস্তার উপরেই একটা জীপ গাড়ীতে সাহেব অপেক্ষা করছিলেন। ধর্মদাস নবীনকে নিয়ে গিয়ে পরিচয় করিয়ে দেয়। বলক্‌বাবু অর্থাৎ ব্লক ডেভলপমেণ্ট অফিসার নবীনকে বললেন, তুমিই ত কিশোরী দাসের ছেলে?

—হাঁ।

—উঠে এসো গাড়ীতে। হুকুমের মত শোনাল। নবীন একবার তাকাল ধর্মদাসের দিকে, প্রশ্নবোধক দৃষ্টি।

—যা যা, বলক্‌বাবু বলছেন, ওনারা হাকিমরে। যা।

—তুমিও চল। ব্লক ডেভেলপমেণ্ট অফিসার ওদের দুজনকেই নিয়ে তাঁর বাসায় এলেন।

বাসা এবং অফিস একটা ঘরেই। এক পাশে একটা টেবিলের উপর কিছু কাগজপত্র ছড়ানো, একটা কাঠের র‍্যাকে কিছু ফাইল।

নবীনকে বসিয়ে ব্লক ডেভেলপমেণ্ট অফিসার বললেন, এ গাঁয়ে তো তুমি অনেক দিন পর আসছ ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—সরকার এ গ্রামে একটা ইস্কুল গড়তে চান, এতে তোমার মত আছে ?

—আজ্ঞে আছে বৈকী। এ ত ভালো কাজ ? কিন্তু তার জন্য আর আমাকে ডেকে এনেছেন কেন ?

—তোমাকে কিছু সাহায্য করতে হবে।

আকাশ থেকে পড়লো নবীন। সে আর সাহায্য করবে কি ? তার কি আছে ? থাকবার মধ্যে আছে তার একতারাটি, আর আছে কণ্ঠসম্পদ। এই দুটি দিয়েই ত বিদ্যালয় গড়ার কাজে কিছু সাহায্য করা হবেনা। ধর্মদাস মুচকি মুচকি হাসছিল সাহেবের কথায়। সাহেব যে তাকে ঠাট্টা করছেন না, তাই পরখ করে নেবার জন্য একবার ধর্মদাসের দিকে তাকাল।

ধর্মদাস বলল, আমাদের ব্যা'টা বিটিরা ইধারে ইস্কুলে পড়বেক রে লবীন, তুই মত দিয়ে দে। কিন্তু কি মত দিবে নবীন।

—আমি যে বাউল, খুড়া !

—সংসারী হলে কি আর চাইতেন সাহেব ? কি বলুন হুজুর ?

—তা ত বটেই। আমরা বলছিলাম, সরকারের টাকা এসে পড়ে আছে, কিন্তু জায়গা কোথায় ? আমরা তোমার কাছে তোমার পড়ে থাকা জায়গাটুকু চাইছি।

ভাববার কিছু নেই নবীনের। সে বাউল, পথই তার ঘর, কি করবে সে চার দেয়ালের অবরোধ নিয়ে ! সে বলল, তাই হবেক হুজুর।

—খুশি হলাম নবীন। আচ্ছা এসো।

সেদিন ভোরেই গোবর জল নিয়ে ঘরে ঢুকতেই ভৈরবী দেখল খাটিয়াটা শূন্য, দেয়ালের দিকে তাকিয়ে দেখলো একতারাটা সেখান

থেকে উধাও হয়েছে। ঘরের এক কোণে ঝুলিটা পড়ে আছে। ঔৎসুক্য বশতঃই ঝুলির ভিতরে হাত দিয়ে দেখলো একতাড়া ঘুঙুর একটা সুতোয় বাঁধা। ঘুঙুরগুলি হাতে নিয়ে খানিক তাকিয়ে দেখলো ভৈরবী। একটু নাড়া দিতেই, একই সঙ্গে সব কটা বেজে উঠলো। চমকে উঠলো ভৈরবী। তার হৃদয়ে গিয়ে আঘাত করলো নুপুরের আওয়াজ। কেমন যেন নেচে উঠল মনটা।

আবার বাজালো—আবার, আবার। একটা আকর্ষণী শক্তি আছে ঘুঙুরগুলির। কিন্তু গেল কোথায় মানুষটি, প্রত্যহই বাইরে যায় সে, কিন্তু এই ভোরে যায় না। এমন অনেক দিন হয়েছে, যখন ভৈরবীই এসে জাগিয়ে দিয়েছে নবীনকে—ওগো এ্যাব্‌রে উঠ। রোদ উঠছে যে। ধড়ফড় করে উঠে বসেছে নবীন। তারপর গেছে বাইরে।

আজ ঘরটা শূন্য দেখে মনটা দমে গেল ভৈরবীর। একবার বাইরে গেল। আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখল, পূব দিগন্তে দিনমানের আবির্ভাবের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। আর একটু পরেই সারা জগৎ আলো করে সূর্য উঠবে। পাখীগুলো অনেক আগেই বেরিয়ে গেছে, তখনো একটা ডালে দুটো শালিক পাশাপাশি বসে সূর্যের তাপে পৃথিবীটাকে দেখে নিচ্ছে।

—কৈ টে হৈল ? ভিতর থেকে তাড়া দিল ভৈরবীর মা।

—ই কী ভাতের গাসি নাকি, ঝাট দিব, ময়লা ফেলাব, গোবর দিব—তবে ত।

মায়ের কথায় উত্তর দিল ভৈরবী। তা দিক্‌, কিন্তু আর বেশী দেরী করাও যায় না। কখন ফিরবে কে জানে! ভৈরবী ঝাঁটা নিয়ে ময়লাগুলি একত্রিত করে ফেলে দিয়ে গোবর দিয়ে নিল। যে কাজটা করতে পনেরো বিশ মিনিট লাগে, সেই কাজটা করতে পুরো এক ঘণ্টা কাটিয়ে দিল ভৈরবী, কিন্তু তবু দেখা নেই মানুষটির। অভিমান হল তার। রাগও হল। যাক বয়েই গেছে তার দেখা করতে। এবার কিছু বললে আচ্ছা করে শুনিয়ে দিবে ভৈরবী। হাতের কাজ শেষ হয়ে যাবার পর চলে যাবে কিনা ভাবছিল, ঠিক এমনি সময়েই একতারার টুন্‌টুন্‌ শব্দ শ্রুত হল।

ভৈরবী দেখা দিবেনা কিছুতেই। গায়ের কাপড়টা সামলে নিয়ে দেয়ালের একপাশে লুকিয়ে থাকল ভৈরবী। গুণ গুণ করে গান গাইছে নবীন। ঠিক বোঝা গেলনা গানের কথাগুলো। ঘরে ঢুকে ভৈরবীকে দেখতে পেয়ে নবীন হাসতে হাসতে গাইলোঃ

আমার কাছে ধরা পড়বে বলেই
লুকিয়ে থাকো আড়ালে
তুমি নিজেই ধরা দিবে বলে
পালিয়ে এসো সকালে।

সরমে রাঙা হয়ে গেলো ভৈরবীর মুখখানা। সে মুখ গম্ভীর করে বললো ; আহা, কি ছিরি গানের! একটা ঘর ছাড়া লক্ষ্মীছাড়ার হাতে ধরা দিতে আমার বয়েই গেইছে। আর দাঁড়াল না ভৈরবী। একটু হাসল নবীন।

পথে যখন নামে নবীন, তখন চলার নেশায় তাকে পেয়ে বসে। গন্তব্যস্থানের ঠিকানা থাকেনা, চলেই যায়। আজও তাই হয়েছিল। দিব্যি মনোরম সকাল—সকাল ঠিক নয়, তখনো সূর্য উঠেনি, তখনো কুলায় ছিল পাখীরা। বেশ একটা সৌন্দর্য ছিল বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মিশে, সূর্যোদয়ের সাথে সাথে সে সৌন্দর্য রূপের বিলুপ্তি ঘটে। সৌন্দর্যের পূজারী নবীন, সুন্দরের সাধনায় সে মগ্ন, তাই প্রকৃতির আহ্বানকে উপেক্ষা করতে পারেনি নবীন। হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূর চলে গিয়েছিল। গ্রাম থেকে দামোদর নদ প্রায় মাইল দেড় রাস্তা। সকাল হয়েছিল গিয়ে দামোদরের কিনারায়। সূর্যদেব তাঁর প্রথম আলোর কিরণ ছড়িয়ে দিয়েছিলেন দামোদরের বালুরাশির উপর। তপণ কিরণে অসংখ্য চোখ যেন জ্বল জ্বল করে তাকায়। নদীর দহে প্রতিবিম্বিত সূর্য খান খান হয়ে যায়। দহের ঘাটে বসে আপন মনে তাকিয়ে দেখছিল সে। দহের ওপাশে যেখানে অনেকগুলো জলজ আবর্জনা জমেছিল, ঠিক সেইখানটায় একটা বড় পাথরের উপর কয়েকটা শামকাহাল পাখি ঘাড় বাঁকিয়ে বসেছিল জলের দিকে তাকিয়ে। হাত-পা-মুখ ধোবার জন্য জলে নামতেই পাখিগুলি উড়ে গিয়ে একটু দূরে বসল। নবীন মনে মনে বললো, আমাকে দেখে ওরা ভয় পেয়েছে। হাত মুখ

ধুয়ে উঠে আসতেই নবীনের দেখা হয়ে গেল মাহিন্দি বাউরীর ছেলে অর্জ্জুনের সঙ্গে।

—তুমি বাউল হঁয়্যা গাঁয়ে আস্যাছ কথাট শুনেছিলুম লবীন, কিন্তুক দেখা কৈরতে লারেছি।

নবীন মাহিন্দিকে দেখেছে। অর্জ্জুনকেও ভালো করেই জানে। অর্জ্জুন ওর সমবয়সী। বাল্যকালের যে কয়টা ছবি মনে পড়ে তার মধ্যে মাহিন্দিদের বাড়ীতে লুকোচুরি খেলার কথাটা মনে আছে। অর্জ্জুন, নবীন, আরো পাড়ার কয়েকটি ছেলে—তার সঙ্গে অর্জ্জুনের এক বোনও থাকত—প্রভা না কি যেন নাম। সবাই বলত পেরভী। বেশ পাতলা পাতলা গড়ন ছিল মেয়েটির। একটা জায়গায় বসে থেকে সে চোরদের চোখ বন্ধ করে রাখত। অর্জ্জুনের কথার জবাব না দিয়ে জিজ্ঞেস করল, কেমন আছ অর্জ্জুন? পেরভী বুঝি শ্বশুর বাড়ীতে?

—না, উ মর্যা গেইছে। সহজভাবেই বললো অর্জ্জুন। শুনে দুঃখ হলো নবীনের।

—কি হঁয়েছিল?

—অসুখ বিসুখ এমন কিছুই হয় নাই। ঘরে ভাত ছিল নাই, না খাত্যা পাঁয়েই মরে গেইছে। উয়ার একট ব্যাটা আছে, নিজের কাছে আন্যা রাখ্যাছি। একদিন আসবে, শুনলুম নাকি বড়ো সোন্দর তুমি গান শিখেছ; একদিন শুনাবে নাই?

—শুনাব বৈকী।

—এখন চলি।

—কুথায় আবার যাবে এই সকালে?

—ইষ্টিশনে। ওই ঠ্যানেই ত কাজ করি। একদিন তুমাকে লিয়ে যাব। বাবুদের গান শুনাবে। —আচ্ছা।

—উয়ারা সোব কলকাতার বাবু, ই সোব গায়েন শুনবেক কুথায়, উয়ারা সোব সিনেমার গান গায়। আমি লিয়ে যাবো।

—তাই হবে।

নবীন বাউল—ভাল বাউল, বড়ো বাউল হবে। নিজেই গান বানাবে সে, নিজেই সুর দিবে। সে গাইবে একতারা হাতে নিয়ে, পায়ে থাকবে

নূপুর, নেচে নেচে গাইবে নবীন। পায়ের নূপুর বাজবে নৃত্যের তালে তালে। অবাক হয়ে শুনবে সবাই। একশ, পাঁচশ, হাজার হাজার মানুষ তার গানের তারিফ করবে। তবে হ্যা, তার সঙ্গে গাইবার জন্য একজন দোয়ারী চাই। ভৈরবীর স্বামীর জাত ব্যবসায় কিছু হয়না। ওকে নিলেই চলবে। কিন্তু তার চেয়ে ভালো হয় যদি রাজী হয় ভৈরবী। গতি বাড়িয়ে দিল নবীন। প্রস্তাবটা করে দেখতে দোষ কি? ঘরে ঢুকতেই ভৈরবীর দেখা মিলল বটে, কিন্তু প্রস্তাব করার সুযোগ পেলোনা। ভৈরবী বেরিয়ে যেতেই পিছন পিছন কয়েক পা গেলো নবীন।

নন্দদুলাল বলল; কুথাকে যাইছ। নন্দদুলাল ভৈরবীর স্বামী। অপ্রস্তুত হল নবীন। আমতা আমতা করে জবাব দিল।

—যাচ্ছিলুম বাইরে, তা তুমি কুথা গেইছিলে দুলাল।

নন্দদুলালের হাতে ছিল একটা ছোট্ট লাঠি। সেইটা দেখিয়ে সে বলল, দেখছ নাই। বাথানে গরু দিয়ে আইলুম হে। এটা প্রাত্যহিক কাজ নন্দদুলালের।

নবীন বলল, ব্রজের নন্দদুলাল গরু চরাতেন, আর তুমি—

—সে নন্দদুলাল ঘরজামাই ছিলনা বাউল। একদিন না নিয়ে গেলেই শাশুড়ীর বাখান (গালাগালি) শুনতে হয়—'এমনিই বসে বসে খাবে নাকি' ? কপাল, কপাল, বুঝেছ বাউল, কপাল।

নন্দদুলালের জন্য বেদনা বোধ করল নবীন। নন্দদুলাল চলে যাচ্ছিল, এরপর তাকে রাস্তার ধারে গিয়ে বসে থাকতে হবে খদ্দেরের আশায়। নবীন ডাকল, নন্দদুলাল!

—ডাকছিলে ?

—তুমি গায়েন শুনতে ভালবাস, না ?

—বাসি।

—যাবে আমার সাথে ? ইষ্টিশনের একটা বায়না আস্যাছে। যাবে ?

—যাব।

আজ অর্জ্জুন অনুরোধ করেছে তার বাড়ীতে যেতে। রাত্রে ফিরে আসবে সে চাকরি করে। ইষ্টিশন বেশী দূরে নয়, প্রত্যহই যাওয়া আসা করে। ইষ্টিশনের জমাদার সে। মাষ্টারবাবুরাও তার কথা

ঠেলে ফেলে দেন না। সময় সময় তাঁদের কাজও করে দেয় অর্জ্জুন। গাড়ী যখন এসে থামে তখন বাইরে যাবার ফটকটার পাশে দাঁড়িয়ে যাত্রীদের টিকিটগুলি চেয়ে নেয়। কেউ দেয়, কেউ দেয়না। যারা দেয়না, তাদের পীড়াপীড়িও করেনা অর্জ্জুন। এইজন্য যাত্রীমহলেও তার খাতির আছে। তারাও শুনে তার কথা। অর্জ্জুন বলেছে মাষ্টারবাবুদের গান শোনাতে হবে। তারা কলকাতার লোক—বাউল গান নাকি শোনেনি, কথা দিয়েছে নবীন। পুরোন গানগুলিকে একবার আউড়ে নিতে হবে। গোঁসাইজীর হাতে লেখা পুঁথি থেকে গান শিখেছে নবীন—দেহতত্ত্বের জ্ঞান, সমজদার লোক, জ্ঞানী জন, গুণী ব্যক্তিরা সে গানের তারিফ করেন। সাধক পুরুষ না হলে এমন উচ্চ মার্গের গান কখনোই বেরোয় না। সাধকের গান শিখিয়েছেন গোঁসাইজী। যত্ন করে শিখিয়েছেন, নিজেও যত্ন ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে শিখেছে নবীন।

নির্মল সকাল। সামনেই হাবুল বাউরীর পড়ো বাড়ীটা. বাড়ীটার চিহ্ন নেই, তবু লোকে এখনো হাবুলদের বাড়ী বলেই জায়গাটাকে চিহ্নিত করে। হাবুল সৌখীন লোক ছিল। ওর সৌখীনতা ছিল বৃক্ষলতার প্রতি, ঘরের আনাচে-কানাচে নানা রকমের গাছ দিয়েছিল হাবুল, আজও তাদেরই একটা বেঁচে আছে। গাছটা দেশী আমের। থোকা থোকা মুকুল এসেছে গাছে। বেশ একটা মধুর গন্ধে আমোদিত হয়ে উঠেছে স্থানটা। সমস্ত পরিবেশ সুরভিত হয়ে উঠেছে। আজ নবীনের হৃদয়েও যেন ছোঁয়াচ লেগেছে নূতনের। আকাশের রক্তিম সূর্য, নদীর কালো জল, বসন্তের প্রথম আবির্ভাব—রাঙিয়ে তুলেছে নবীনকে। সে আর থাকতে পারছে না। সুর তার অন্তর থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে।

নবীন একতারাটি হাতে নিয়ে আপন মনেই গান ধরল—

"সমাগত মধুমাস,
না আয়ল পীতবাস
চিতে মদন বিকাশ
তনু শিহরে
নব ফুলে অলিকুল মাতি গুঞ্জরে ॥

বার বার গাইল নবীন। গানের মধ্যে আত্মহারা হয়ে গিয়েছিল সে।

—কিষ্ট ঠাকুর কি রাধার গান গাইছিলে?

একটা গ্লাসে এক গ্লাস দুধ নিয়ে এসেছে ভৈরবী। দুধ দেবার কথা নয়। ঘরের গাইয়ের যে দুধ হয় তা বিক্রিই করে দেয় ভৈরবীর মা। দান করবার বা অতিথি সৎকার করবার মত অবশিষ্ট কিছু থাকে না। নবীন গান থামিয়ে তাকাল ভৈরবীর দিকে। মনটা খুশিতে ভরে উঠল তার। এই সময় হয়ত তার মন ভৈরবীকেই চাইছিল।

—তুমি কখন আইলে? জিজ্ঞেস করল নবীন।'

—তুমার কি চোখ ছিল কিষ্ট ঠাকুর। কতক্ষণ আস্যাছি।

সত্যিই তাই, অনেক আগেই এসেছে ভৈরবী। এসে দাঁড়িয়েছিল দরজার পাশে। শুনছিল নবীনের গান। মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল সে। নবীনের সুরকে সমাধিস্থ করতে চায়নি ও। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনেছিল শুধু।

—কুথায় ছিলে?

—তুমার চোখের ছামুতেই। কিন্তু চোখ ত তুমার ছিলনা। সত্যিই বলত কার গান গাইছিলে?

—যদি বলি তুমার।

কথাটা বলে নিজেই চমকে উঠলো নবীন। একথা বলা ঠিক হয়নি। ভৈরবীর বিয়ে হয়েছে। তার স্বামী বর্তমান। অন্য কেউ তার কথা ভাববে এটা ঠিক নয়। এ চিন্তা করা অপরাধ। নবীন অপরাধ করেছে-সে অপরাধী। এর জন্য তার মাপ চাওয়া উচিত। সে হয়ত মাপ চাইবার জন্যই কি একটা কথা বলতে যাচ্ছিল, ঠিক এমনি সময়েই ভৈরবী বলল, আমার কথা আর কি দুঃখে ভাবতে যাবে শুনি। লাও। দুধের গ্লাসটা এগিয়ে দিল ভৈরবী।

নবীন বলল, এই দুধটুকু তোমার ভাগ থেকে কাটে দিছ ত!

—আমি অমনি মিয়া নাকি? আজ লগদী নাই, তাই বাঁচল, লিয়ে আইলুম। লাও খায়্যা লাও।

নবীন আর কিছু বললো না। দুধটুকু খেয়ে ফেললো সে।

ভৈরবী বসলো নবীনের সামনে। সে বললো, তুমার গায়েন বড়ো

মিঠা কিষ্ট ঠাকুর। আমাকে ত আর শুনাবে নাই, তাই আড়াল থাক্যা শুনল্ম।

—তুমি গান শুনবে ভৈরবী ?

আজ সত্য সত্যই নবীনের মন, অপরকে গান শোনাবার জন্য অস্থির হয়ে আছে।

—শুনালে শুনব বৈ কী। উত্তর দিল ভৈরবী।

—এখুনি শুনবে ?

ভৈরবীকে গান শোনাতে পারলে সে যেন কৃতার্থ হয়।

—ওমা বললাম, আর তখনি তখনি রাজী কি হৈতে হয় কিষ্ট ঠাকুর ? ইয়াতে যে দর কমে যায়।

—আমাদের তাতে ক্ষতি নাই।

—ক্ষেতি নাই ? সেকী ! বিষ্টু মড়লের মদের দর কমলে ক্ষেতি হয়, নারাণ মুদির তেলের দর কমলে ক্ষেতি হয়, আর তুমার দর কমলে ক্ষেতি হবেক নাই ?

—তুমার কাছে ত গান আমি বিক্রী করছি নাই ভৈরবী। শুনবে, গাইব ?

—গাও।

এই কথাটি শুনবার জন্যই তার যেন এতদিনের সাধনা। সে সানন্দে একতারাটি তুলে নিয়ে গলার সুরের সঙ্গে তারের সুর মিলিয়ে নিয়ে গাইলো—

তোমায় ধরব বলে ধরতে নারি
তুমি একী খেলা কর
তুমি কাছে থেকেও পাইনা কাছে
তুমি আপন হয়েও পর।

ভৈরবী স্থান কাল ভুলে গিয়ে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল নবীনের মুখের পানে। নবীনের কণ্ঠে আজ যেন বাগ্‌দেবী অধিষ্ঠান করেছেন—

তোমার এই লুক লুকানি খেলা
আমার সকাল সাঁঝের বেলা
পাগল করে মাতাল করে—

—ও টে ও ভৈরবী !

একটা কর্কশ কণ্ঠস্বর বেসুরো করে দিল একতারার সুর। থমকে গেল নবীন।

—ওই আস্যাছে ! উঠে দাঁড়ালো ভৈরবী।

—চল্লে নাকি ভৈরবী ?

—শুনলে নাই ? মা ডাকছে। আবার আইসব। ভৈরবী ভিতরে যেতেই ভৈরবীর মা গর্জে উঠে বললো, ঘরের কাজ-কম্ম ফেলে দিয়ে গায়েন শুনতে এ্যাল্প লাজ লাগল নাই।

ভৈরবী বলে উঠলো, ঘরের কুন্ কাজ-ট বাকী আছে শুনি।

—গোরুর ঘাঁটা কর‍্যাছিস ? আজ যে ক' দিন ধরেই বলছি, এক বঝা (বোঝা) কাঠ লিয়ে আয় বন থাক্যা, কয়লা শেষ হৈল—তা শুনেছিস্ ? কাজ—, 'কৈরব' বল্লে অনেক আছে, 'কৈরব নাই' বল্লে কিছুই নাই। গিলাস ট কুথা ? শির তুলা গিলাস ট ?

—বাইরের ঘরে। যাই লিয়ে আসি।

—না থাক্, আমিই লিয়ে আসব। বাবারে বাবা, গুরু ঠাকুর আস্যাছেন। কুথাকার কে, তার ঠিক নাই, তার সেবা কর।

—সেবা কে করছে ?

—কথা বাড়াস্না বাছা ! নিজের মরদ পড়ে থাকল, আর—

—মা

চীৎকার করে উঠলো ভৈরবী। মাকে সে প্রতিনিবৃত্ত করতে চাইলো।

—আমাকে চোখ রাগাসনা ভৈরবী। আসুক আজকে তুর বাপ ! লজ্জায় অপমানে মাটির সাথে মিশে যেতে চাইছিল ভৈরবীর মন। ছি ছি, এ সব কথা বাউলের কানে গেলে সে কী মনে করবে ? সে মাকে অনুনয় করে বললো, তুই চুপ কর মা। তুই চুপ কর !

—চুপ কৈরব ? ঘরের মানুষ বুলে বুলছে বাইরে বাইরে—ওই ঘরটায় দকান কৈরেছিল নন্দ দুলাল—তা সইলো না, রাস্তায় বসে লোকের জুতা সেলাই করছে। আর পরকে আন্যা রাজ্য পাটে বসাঞছে।

ভৈরবী আর কোনো প্রত্যুত্তর না করে আস্তে আস্তে ভিতর ঘরে গিয়ে বসলো। সে জানে তার মাকে—একটু ছিদ্র পেলেই হলো—সে

ছিদ্র আর ছিদ্র থাকবে না ভৈরবীর বসে থেকেও সোয়াস্তি নেই। তার মা তার কাছে এসে হাত নেড়ে বললো, ইয়ার পর তুই আর বাইরের ঘরকে যাবি নাই ভৈরবী। ছিঃ ছিঃ এ কী কথা কইছে তার মা! মনে করেছিল চুপ করেই থাকবে, কিন্তু এর জবাব না দিয়েই বা করবে কি! সে বেশ রেগেই বললো, তুই যদি বকবি, তবে চল্লুম আমি ঘর ছাড়্যা।

এইখানেই ভৈরবীর মায়ের দুর্বলতা। বিশ্বাস নাই ভৈরবীকে—হয়ত সত্যি সত্যিই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাবে সে। কোথায় যাবে কে জানে! যদি রাগের মাথায় একটা বিষম কিছু ঘটায়।

ভৈরবীর মা বললো, হপ্ করতেই যে 'চলে যাব' বলিস, ত' যাবি কুথাকে! কেউ কি ডাক্যা লেবার লোক আছে ?

ভৈরবীর উত্তর দেবার আগেই ধর্মদাস এসে ঘরে ঢুকলো। সেই সকালে গোরু বাছুর খুলে দিয়েই বিষ্টু মড়লের কাছে গিয়েছিল ধর্মদাস। বড়ো বড়ো পাকড় করছে বিষ্টু।

—ত্থাখ্ ধর্মদাস, তোর ওই চিলতা জমিটুকু, এমন কিছু কাজে আসে না—অথচ ওইটুকু হলে আমার একটা বড় ক্ষেত হয়।

চিলতাটুকু বললেও—পাকা দশ কাঠা জমি। যে বছর ভৈরবী হলো, সেই বছরই ওই জমিটুকু কিনেছিল ধর্মদাস। ভৈরবীর নাম করেই কিনেছিল, কাজেই নৈতিক দিক থেকে বিচার করে দেখলে জমিটার উপর দাবি যদি কারো থেকে থাকে তবে ভৈরবীরই। তাই বিষ্টুকে বলেছিল, উ জমিটুকুর আসল মালিক ত আমি লই মড়ল, উয়ার আসল মালিক ভৈরবী।

—আরে আমি ত আর তোর কাছে এমনি এমনি নিচ্ছি না। পাঁচজনে যা দাম বলে তাই দিব, না হয় দু দশ টাকা বেশীই দিব।

—দেখব বিটিকে শুধাই। যদি রাজী হয়, তারপর ত দাম।

এই বলেই চলে এসেছিল ধর্মদাস। ধর্মদাস ঘরে ঢুকতেই ভৈরবীর মা চীৎকার করে বললো, এই ত আস্যাছ—লারব, লারব আমি তুমার ঘর করতে। অবাক হলো ধর্মদাস।

ভৈরবী বাবার কাছে এসে বললো, তুমি চল আমাকে কুথাও রাখ্যা দিয়ে আসবে বাবা।

এতক্ষণে পরিষ্কার হয়ে গেল অবস্থাটা। ধর্মদাস বললো, ছিঃ ছিঃ, আবার মা-বিটিতে লিয়াই করতে আরম্ভ কৈরেছে।

—বিটিকে সাবধান করতে গেলেই লিয়াই করা হয়। ভাল কথা বললেই দোষ!

—কি ভালো কথা?

—কি আবার, বল্লাম, নন্দ দুলাল অমন বাইরে বাইরে ঘুলে বেড়াছে, উয়ার উপর কি তুমার বিটির কুনু কত্তব্য নাই?

—তা উ কি করবেক?

—ঘরের ছিলাকে ঘরে রাখবেক।

—ব্যাটাছিলা আবার ঘরে রইবেক কি? কাজ কম্ম দেখুক।

ধর্মদাসের ছেলে ছিল না। ছিল ওই মেয়ে। বিয়ে দিয়ে ছেলে নিয়ে এসে তাকে মানুষ করে নেবার একটা কল্পনা করেছিল ধর্মদাস। এই জন্যই একটি অনাথা ছেলেকে জামাতা করে এনেছিল ধর্মদাস। মুচির ছেলে—জাত ব্যবসাটা যদি ভালো করে শিখে নেয়, তবে আর যাই হোক উপোসে মরবে না ভৈরবী। এই জন্য রাণীগঞ্জের একটা দোকানে ঠিকার কাজ যোগাড় করে দিয়েছিল ধর্মদাস। কিন্তু কপাল মন্দ—হ্যাঁ কপাল ছাড়া আর কাকে দোষ দিবে, রোজগারের টাকা লণ্ড-ভণ্ড করে ঘুচিয়ে দিয়েছে, রাণীগঞ্জে কিছু দেনাও করেছিল নন্দ দুলাল। সেই ঋণ শোধ দিতে হয়েছিল ধর্মদাসকেই। এর জন্য একটা দামড়াকেই বিক্রী করতে হয়েছিল তাকে।

—বসাই খাতে দেবার মতন ক্ষ্যামতা আমার নাই, বুঝলে? ধর্মদাস বললো। রূঢ় শোনাল কথাটা।

এ সত্যটুকু ভৈরবীর জননীও স্বীকার করে, কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তেই সম্পূর্ণ ভাবে ধর্মদাসকে সমর্থন করতে পারলো না; সে বললো, এই কথাটা বলবে ক্যানে জামাইকে। তুমার তরে দেখছি পেটে ধরেছি যে বিটিকে, তাকে ভালো মন্দ শিখাবার জো নাই।

—নাই কে বলছে, কিন্তুক তাই বলে পেটের বিটির সাথ ঝগড়া করতে হবেক?

॥ তিন ॥

নবীন একটি মনের মতন সঙ্গী পেয়েছে,—(সঙ্গী ঠিক নয়, এরা 'বন্ধু' কথার স্থানে সঙ্গ কথা ব্যবহার করে, এর থেকে সাঁগোতি কথা এসেছে) সে হলো অর্জ্জুন। অর্জ্জুনকে তার নাম জিজ্ঞেস করলে নামের শেষে পদবী বলে ক্ষেত্রপাল। 'বাউরী, উপাধীটা ত্যাগ করেছে অর্জ্জুন—শুধু অর্জ্জুনই কেন—এ অঞ্চলের সব বাউরীরাই। যদিও এতে সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন হয়নি। আগেকার বাউরীদের যা করতে হতো, এখনকার ক্ষেত্রপাল এবং ক্ষেত্রপালিকারা তাই করে। করে মানে করতে বাধ্য হয়। বাউরীদের সাহনের মা বুড়ী বলেছিল, বাইশী কৈরে বলে দিলেক কারু ঘরের ভোজের পাতা কুড়াতে পাবেক নাই কেউ, মরদরা পালকী বইতে পাবেক নাই, মিয়ারা কামিন খাটতে যাবেক নাই, ত খাত্যা দেক বাইশীর লোকে। এই যে উপাস দিয়ে দড়ি দড়ি হৈলুম, দেক খাত্যা। খাবার নিজেদেরই সংগ্রহ করতে হবে, কেউ কারো জন্য কিছু করে দিবে না, অগত্যা ক্ষেত্রপাল উপাধী হয়েই থাকল, অর্থনৈতিক পরিবর্তন কিছু ঘটালো না।

বিকেলের দিকে হাঁটতে হাঁটতেই ইষ্টিশনের দিকে রওনা হলো নবীন। মাইল তিন রাস্তা। মাইল খানেক গেলেই একটা চড়াই-এ উঠতেই ইষ্টিশনের ঘরগুলো, সিগন্যাল আর টেলিগ্রামের থাম্বাগুলো ছবির মত নজরে পড়ে। ইষ্টিশনের কাছাকাছি গেলে ওর পিছনের খানিকটা অংশও নজরে পড়ে। কয়েক শ' বিঘা ধানের ক্ষেত পড়ে আছে। ফসল উঠে গেছে, বিধবার মত রিক্তা জমিগুলির দিকে তাকালে চোখে জল আসে। সম্ভাব্য সম্পদে পরিপূর্ণ ওর অন্তর, চারিদিক থেকে জীবনী শক্তি সঞ্চয় করে রেখেছে, চৈত্রের দিনে মাটির অন্তর থেকে বেরিয়ে আসে অন্তরের কথা। সে কথা মিশে থাকে চৈত্র দিনের আলো-বাতাসে, যার চোখ-কান আছে সেই শুনতে পায়।

ধেনো ক্ষেতের ওপারে ছোট্ট একটি গ্রামের প্রান্তে কলিয়ারীর কল-কব্জাগুলি দেখতে পাওয়া যায়। ওদিকটায় কখনো যায়নি নবীন।

ওদেশের কাহিনী শুনেছে তার গোঁসাইজীর কাছে। পৃথিবীর নীচে পাতাল—সেই পাতাল থেকে কয়লা তুলে আনে মানুষে। সে অন্ধকার রাজত্ব, নিজের হাত নাকি নিজে দেখতে পায় না। একবার যাবে নবীন ওই অন্ধকারের রাজত্ব দেখতে!

নদী পেরিয়ে পাকা সড়কের উপর লেভেল ক্রসিংটার কাছে আসতেই তার ভাবনার সূত্রটা গেলো ছিঁড়ে। তবে চলে এসেছে নবীন। কোন সময় যে এতটা পথ চলে এলো নবীন তা নিজেও ঠিক বুঝতে পারেনি। লেভেল ক্রশিংটার ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে পড়তে হলো নবীনকে : ফটকটা বন্ধ। একটা গাড়ী আসছে, সেটা যতক্ষণ না পেরিয়ে যাবে ততক্ষণ ফটক খুলবে না। ওপাশে গোটা কয়েক গোরুর গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে—এপারে আসার অপেক্ষায়। লেভেল ক্রশিংটাকে বাঁ হাতে রেখে ডান দিকের পায়ে চলা রাস্তাটায় একটু এগিয়ে গিয়ে লাইন গুলোকে পেরিয়ে ওপারে যাবার একটা সোজা রাস্তা আছে। নবীন এখানে দাঁড়িয়ে না থেকে এই পথটা দিয়েই ইষ্টিশানে পৌঁছালো।

ইষ্টিশনটা ফাঁকা। সাইডিং লাইনে একটা ইঞ্জিন দাঁড়িয়ে ফোঁস্ ফোঁস করে ষ্টীম ছাড়ছিল। রোড সাইড ষ্টেশন। সন্ধ্যা হলেই খালি হয়ে যায়। ষ্টেশনের পিছন দিকের কয়েকটা চা-পানের দোকানে তখন ষ্টেশনের পোর্টার জমাদার খালাসীরা গিয়ে আড্ডা জমায় হরির দোকানে। হরির অনেককাল আগের একটা গ্রামোফোন আছে, অনেকবার বাজিয়ে বাজিয়ে রেকর্ডগুলো মসৃণ হয়ে গেছে। নূতন পিন কিনবার দরকাব মনে করেনা হরি। পুরাতন ব্যবহৃত পিনগুলোই ব্যবহার করে। অত্যন্ত ক্ষীণ আওয়াজ উঠে। নিকটের লোকগুলিই শুনতে পায়। সুরয প্রসাদ খালাসী বলে, এ হরিদাদা, ইটো বিক্রী করে দিয়ে আয়। হরি কথা শুনে হেসে বলে, ঠাকুর্দার আমলের জিনিস, জানিস। হরির গ্রামোফোনে সঙ্গীত উপভোগ করবার জন্য নয়,—হরির জন্যই তার দোকানে গিয়ে জমায়েৎ হয় সবাই। হরি তাদের আপ্যায়ন করে। বিড়ির বাণ্ডিল থেকে বিড়ি বের ক'রে খেতে দেয়। চা বসিয়ে দেয় এক কেট্‌লি। পয়সা চায় না। এরাও বিনি পয়সায় খায় না। ওয়াগন থেকে কাঁচা কয়লা নামিয়ে এনে হরিকে দিয়ে যায়। কয়লা কিনতেই হয়না হরিকে। হরির

দোকানের দিকে এগিয়ে গেলো নবীন। হরি গ্রামোফোনে একটা হিন্দি গান লাগিয়েছিল। নবীন যেতেই অর্জ্জুন তাকে জড়িয়ে ধরে উচ্ছ্বসিত আনন্দে বললো, আরে বাউল ঠাকুর যে!

—হাঁ ভাল লাগল নাই গাঁয়ে থাকতে। উত্তর দিল নবীন।

—বেশ কৈরেছ। হরিদাদা এক কাপ চা দাওহে। বেশ ইষ্টরং কৈরে দিও।

—দেরে পীতু, এক কাপ চা দে। হরির দোকানে যে কম বয়সী ছেলেটা কাজ করে তাকেই হুকুম করলো হরি। সুরজ নবীনের হাতে একতারাটি দেখে অর্জ্জুনকে বললো, গীত হোবে ত জমাদার?

—এমনিই গীত হয় নাকি। পয়সা ফেল, হবেক। পয়সার কথায় সুরয প্রসাদের আর উৎসাহ দেখা গেল না।

চা খাওয়া হয়ে গেলে ছোট গ্লাসটা নিজেই ধুয়ে দিল নবীন।

এবারে প্রস্তাব এলো স্বয়ং হরিদাদার কাছ থেকে। না করতে পারলোনা অর্জ্জুন। নবীনকে জিজ্ঞেস করলো, হবেক নাকি বাউল ঠাকুর?

নবীন আপত্তি করলো না। বললো, গোঁসাইজীর গান গাই?

—তাই হোক। বললো হরি।

নবীন গাইলো—

কে গড়েছে এমন ঘর, ধন্য কারিগর
ও তার কারি কুরির বলিহারি রে—
ও সে কারিগরের কোথায় ঘর॥

বিভোর হয়ে গাইলো নবীন। দেহতত্ত্বের গান। গাইতে গাইতে সব ভুলে যায় নবীন।

হরি বললো, চমৎকার। গলাটি বড়ো মিঠা।

ঠিক এমনি কথা গোঁসাইজীও বলেছিলেন, সুরের সাধনায় তুই সিদ্ধ হবি নবীন।

—শুনলে ত হরিদাদা? ওই বাবা আমাদের গাঁয়ের লোক। হরির পাশের দোকানটা বাসুদেব মুখুজ্যের। ষ্টেশন থেকে পোয়া খানেক রাস্তা গেলেই বাসুদেবের গ্রাম। সকাল থেকে রাত্রি দশটা পর্যন্ত

দোকানে থেকে গ্রামে ফিরে যায়, ছেলেটা থাকে দোকানে। সকাল হলে আবার ফিরে এসে দোকানে কাজ করে। গান শুনতে সেও এসেছিল। সে বললো, তোদের গাঁয়ের সবাইকেই ত আমি চিনি রে, এ কার ছেলে ?

—কিশোরী ডোমকে চিনতেন কি বাবু? নবীন নিজেই জিজ্ঞেস করলো।

—তা আর চিনতাম না? আমাদের গাঁয়ে কতবার বাজিয়ে গেছে। তুই কিশোরীর ব্যাটা নাকি ?

—হাঁ বাবু। বিনয় সহকারে উত্তর দিল নবীন।

—তাই বল, চেহারাটা দেখেই কেমন যেন চেনা মনে হয়েছিল। তোদের নিয়ে কিশোরী শেষে গান গেয়ে গেয়ে বেড়াত—কলকাতাতেও নাকি নিয়ে গিয়েছিল। মেডেল দিয়েছিল অনেকে ?

—হাঁ বাবু।

—তাই বল, বেঁচে থাক্ ব্যাটা বেঁচে থাক্। বাপের নাম রাখিস। আশীর্বাদ করে চলে যাচ্ছিল বাসুদেব।

—যাচ্ছ নাকি ঠাকুর? জিজ্ঞেস করল হরি।

—হাঁ রে, যাই রাত হয়েছে। অন্ধকার রাস্তা। উত্তর দিল বাসুদেব।

—তা এতই যখন যশ করলে, তখন দাওনা দু চার আনা। বাঁচ্যা থাকলে তবে ত বাপের নাম রাখবেক? কি বল হরিদাদা।

বাসুদেব অপ্রস্তুত হলো। হাসতে হাসতে বললো, দু চার আনা পয়সা কি পালিয়ে যাচ্ছে অর্জুন! ব্রাহ্মণের আশীর্বাদ দু চার আনা পয়সার অনেক উপরে।

—কিন্তু আশিব্বাদে যে প্যাট্ ভরে না, এই ত মস্কিল। এ কথার কোন জবাব না দিয়ে চলে গেল বাসুদেব।

—জমাদার, জমাদার! ষ্টেশন থেকে ছোটবাবু হাঁক দিলেন।

—যাই।

ছোটবাবু ষ্টেশনের প্লাটফরম থেকেই চীৎকার করে বল্লেন, —থ্রি, সেভেন্‌টি নাইন আপের লাইন ক্লিয়ার।

— উঠি হরিদাদা। শালা নকরীর নিকুচি করেছে। শালা দু দণ্ড বসবার জো নাই হে।

—বসনা, যাবি এখুনি। বললো হরি!

— আরে ই বড়ো খিচ্‌খিচিয়া আদমী। উঠে গেল অর্জুন।

রাত আটটায় অর্জুনের ডিউটি শেষ হলো। সাধারণত এত রাত্রে আর গ্রামে ফিরে আসে না অর্জুন। রাতটা হরির দোকানে, নয় ইষ্টিশনের ভিতরে ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেয়। সকাল হলে হরির দোকানে এক কাপ গরম চা খেয়ে চলে আসে।

—আজ চললুম হরিদাদা। ডিউটি সেরে এসে হরির দোকানে উপস্থিত হলো অর্জুন।

হরির দোকানে কোনো খদ্দের ছিল না, থাকবার কথাও নয়। রোড সাইড ষ্টেশন। প্যাসেঞ্জার ট্রেণের আসা যাওয়ার সঙ্গে এদের সম্বন্ধ। এ ছাড়া দু চারটা ছুটকা ছাটকি খদ্দের এসে উপস্থিত হয়— ইঞ্জিনের ড্রাইভার নয় ফায়ারম্যান্। এখন আর কেউ নেই —তাই অবসর বুঝে হরি রান্না চড়িয়েছিল। নবীন বসেছিল। — আজ সঙ্গী আছে বলে?

—ঠিক ঠাওরেছ।

—আমি বলছি, চারটি না হয় এইখানেই খাতিস্। বাউল গান শোনালো কিছু ত খেলোনা।

—সে আরেক দিন খাবেক। রাত হৈছে।

উঠে পড়লো নবীন। যাবার সময় হরি চার আনা পয়সা দিল নবীনের হাতে।

অন্ধকার হয়ে গেছে চারিদিক। ষ্টেশন প্লাটফরমের সীমানা পেরিয়ে সড়কে নামতেই অন্ধকার আরো গাঢ় মনে হলো। আকাশের পানে তাকিয়ে দেখলো নবীন—অসংখ্য নক্ষত্র তাকিয়ে আছে পৃথিবীর পানে। পৃথিবীর সঙ্গে ওদের যোগ আছে। সম্পর্ক আছে। আছে—, মহাপুরুষরা দেহত্যাগ ক'রে আকাশে নক্ষত্র হয়ে বিরাজ করেন। ওই এক একটি নক্ষত্র এক একটি মহাপুরুষ। ওই ত শুক্রাচার্যের স্থান, বৃহস্পতি ওইখানে আছেন। সাধারণ পুণ্যাত্মা মানুষের সুখ-দুঃখে ভরা

জীবনের প্রতীক ওই ত সাত ভাই চম্পা। সপ্ত ঋষির চোখ মেলে তাকিয়ে আছেন এই দিকে। আজ নক্ষত্র খচিত আকাশের দিকে তাকিয়ে অকস্মাৎ গোঁসাইজীকে মনে পড়লো তার। চোখ বন্ধ করে প্রণাম জানালো গোঁসাইজীর উদ্দেশে।

এই সঙ্গে মনে পড়লো প্রথম দিনের ঘটনা। নবীন যেদিন ঘর ছেড়ে বাউণ্ডুলের মত ঘুরতে ঘুরতে একটা গানের আসরে দেখা পেয়েছিল গোঁসাইজীর। দীর্ঘ অবয়ব। গৌর কান্তি। দীর্ঘ শ্বেত শ্মশ্রু—ঋষির মত দেখাচ্ছিল গোঁসাইজীকে। তেমনি গান—মুগ্ধ হয়ে শুনছিল সবাই। নবীনের সুরেলা মন বলে উঠেছিল—পেয়েছি, যা চেয়েছিলাম তাই পেয়েছি। গানের আসর ভাঙার পর নবীন পা ছুঁয়ে প্রণাম করে বলেছিল, আমিও গান শিখব ঠাকুর! শুনে খুশি হয়েছিলেন গোঁসাইজী। হাসিতে মুখ উদ্ভাসিত করে বলেছিলেন, বেশ ত। ঘর কোথায় তোর বাবা। নিজের গ্রামের পরিচয় পিতার নাম বলে বলেছিল, আমি ডোমদের ছিলা!

—তা হলি ত কি হবেক রে। জাতটা কি মানুষের পরিচয় রে। আমরা বাউল, আমাদের কাছে মানুষের থেকে বড়ো কিছু নেই রে,—

এমন মানব জনম আর কি হবে
মন যা করো ত্বরায় করো এই ভবে।
অনন্তরূপ সৃষ্টি করলেন সাঁই
শুনি মানবের উত্তম কিছু নাই
দেব দেবতা গণ
করে আরাধন
জন্ম নিতে মানবে।
কতো ভাগ্যের ফলে না জানি
মনরে পেয়েছ এই মানব তরণী
বেয়ে যাও ত্বরায় সুধা রায়
যেন ভরা না ডোবে।
এই মানুষে হবে মাধুর্য ভজন
তাই ত মানুষরূপ গড়লে নিরঞ্জন
এবার ঠকলে আর
না দেখি কিনার
অধীন লালন তাই ভাবে।

সেই থেকেই গোঁসাইজীর কাছে থেকে গিয়েছিল নবীন।

—ইধারে এক ট আখড়া কর বাউল ঠাকুর। বললো অর্জ্জুন। প্রস্তাবটা মন্দ নয়। কিন্তু আখড়া গড়বার মত মাল মশলা তার কোথায়?

—তুমি সাহায্য করবে?

—করব ; কিন্তুক এক ট দল গড়তে হবেক।

এ ইচ্ছা যে কোনো দিন হয়নি নবীনের তা নয়, সেও এমনি একটি দল খুলে গ্রামে গ্রামে গেয়ে বেড়াবে গান। মানুষকে শোনাবে মানুষের গান। আবার মনে পড়লো গোঁসাইজীর উপদেশ। গোঁসাইজী বলতেন, জানিসরে, শাস্ত্রে বলেছে পুরুষান্ন পরং—, মানুষ থেকে শ্রেষ্ঠ কিছু নেই। শ্রেষ্ঠত্বের সেবা করাই ত আমাদের ধর্ম।

—তুমি সহায় হলে আমি সব পারি অর্জ্জুন।

— আছি। আমি আছি। ওই নদীর ধারের বট গাছটার কাছেই আখড়া হবেক বাউল ঠাকুর।

—কার জমি ? সে যদি না দেয়।

—আমি আছি।

নবীন হাসলো অর্জ্জুনের কথা শুনে।

—হাসবে নাই বাউল ঠাকুর। আমি না থাকলে কবে হরিদাদার দকান ডকে উঠে যায়।

হরির ব্যবহারে আজ অত্যন্ত মুগ্ধ হয়েছে নবীন। তার বিপদের কথার উল্লেখ করতেই স্বভাবতই ঘটনাটা জানবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করলো নবীন।

—কি হুঁয়েছিল ?

—শুনবে ? তবে শুন। ইষ্টিশনের বড়োবাবুর সাথে হরিদাদার বাধলো লিয়াই। বড়োবাবু রিপোর্ট করলেক, হরি নাকি রেলের জায়গায় দোকান করেছে। মাপ জুক হৈল, ফিতা দিয়ে। হুঁ— সত্যিই, রেলের জায়গা বিরাঞ গেল। লুটিশ হৈল হরিদাদার উপর— উঠে যাতে হবেক। হরিদাদা বললো, কি করি অর্জ্জুন ? আমি কইলাম, আরে রাখ। কুমপানীর অমন কত লুটিশ হয়। খসাও দেখি কিছু টাকা। দিলেক হরিদাদা। বলা মাত্র দিলেক দশ টাকার করকরে দুটা নোট। ব্যাস্ সব ঠিক। দু জনে কথা কইতে কইতে কখন নদী পেরিয়ে এপারে এসে গ্রামের মাথায় উঠেছে, বুঝতেই পারেনি ওরা। গ্রামের তেমাথায় আসতেই অর্জ্জুন বললো, আমার ত এই ডান দিকের রাস্তা বাউল ঠাকুর।

রাস্তাটা জঙ্গলাকীর্ণ, তারউপর একটা পুকুরের পাড়ের উপর দিয়ে যেতে হয়। রাত্রিবেলায় বলতে নেই—লতার ভয়ও আছে। তাই অর্জ্জুন বললো, ঘুরে গেলে হৈত নাই? নবীন চলতে চলতেই উত্তর দিল, গা বাঁধা, রাস্তা বাঁধা, ইদিকে কেউ আসতে লারবেক হে।

হন্ হন্ করে চলে গেলো অর্জ্জুন। কাঁচা চামড়ার জুতোর শব্দ স্পষ্ট হতে অস্পষ্ট হয়ে উঠলো। নবীন মাঝের রাস্তাটা ধরে ঢুকলো গ্রামের ভিতর। ইচ্ছা করেই এই রাস্তায় এলো নবীন। আরো কয়েক পা গেলেই কালোর দোকানটা পাওয়া যাবে। অনেক রাত পর্যন্ত দোকান খোলা থাকে কালোর। শহর থেকে যে বাসগুলি আসে, তাদের ড্রাইভার কনডাকটাররা কালোর দোকানে রাত্রির খাবার খেয়ে থাকে। কালোর বুড়ী মা বাইরের দোকানটা আগলে বসে থাকে উনোনটাকে কোলের কাছে নিয়ে। কালো তাস খেলতে যায়। ড্রাইভাররা এলে বুড়ীই ডেকে দেয় ছেলেকে।

ক্ষিদে পেয়েছে নবীনের। হরির দেওয়া চার আনা পয়সাও আছে তার কাছে। মুড়ি কিনে খেয়ে নিবে নবীন—আনা দুই এর মিঠাই কিনে নিবে, ভৈরবী সকাল হলেই দুধের গেলাস নিয়ে এলে তাকে ধরিয়ে দিবে মিঠাই-এর ঠোঙাটা। নবীন কালোর দোকানে এসে দু আনার মুড়ি খেয়ে নিলো, বাকী দু আনার মিঠাই কিনে আপনার উত্তরীয়ের এক প্রান্তে নিলো বেঁধে।

এ পাড়াটা আজ-কাল সন্ধ্যা হলেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে। এখন ত বেশ রাত্রি হয়েছে। শহরের শেষ বাস চলে এসেছে। বাইরের দরজার কপাট কারো নেই। বাইরের থেকে উঠোনটা দেখায়। এদের মধ্যেই যারা একটু সঙ্গতিপন্ন তারা আগল করে নিয়েছে। ধর্মদাস এদের দলেই। ধর্মদাসের বাইরের ঘরটা বাইরের দরজার পাশে। ভিতরের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। ঘরটার দরজা আছে—দরজার কপাট আছে। কেউ না থাকলে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে যায়। নবীন গিয়ে উপস্থিত হতেই দেখলো কে যেন চলে যাচ্ছে আড়াল দিয়ে। ঠিক ভৈরবীর মত চলন ভঙ্গী।

—ভৈরবী! অনুচ্চ স্বরে ডাকলো নবীন। খুশিতে তার মনটা

ভরে উঠল। ভালোই হলো—এই অবসরে মিঠাইগুলি দিয়ে দিবে নবীন। ছায়া মূর্তিটি নিশ্চল হয়ে দাঁড়ালো। এক পা এক পা করে এগিয়ে গেল নবীন।

—কে ভৈরবী ?

—চুপ্! হিস্ হিস্ করে বললো ভৈরবী।

—কিছু না বলে চলে যাইছ যে ? কিছু বলছিলে ?

—তুমার খাবার ঢাকা আছে।

—আমি খায়্যা আস্যাছি।

—কুথায় ?

—কালোর দোকানে, তোমার জন্যই নিয়ে এসেছি। এই নাও।

—না।

নবীন মনে করলো এ-তার অভিমানের কথা। তাকে না বলে সে আজ প্রায় সারাটা দিন ষ্টেশনে কাটিয়ে এসেছে—এরই জন্য হয়ত অভিমান করেছে ভৈরবী। তাই বললো, যাবার সময় তোমাকে বলতে ভুলেই গেইছিলুম।

—আমি যাই। বললো ভৈরবী।

নিরাসক্ত কণ্ঠস্বর। এ কণ্ঠস্বরে চমকে উঠলো নবীন।

—তোমার কি শরীর ভালো নাই ?

—আছে, না হলে আর তোমার কাছে দাঁড়াঞ আছি কি করে। রাত হঁয়েছে, যাও।

চলে যাবার জন্য পিছন ফিরতেই নবীন আবার ডাকল, শুন!

—থমকে দাঁড়ালো ভৈরবী।

—তোমার কি হয়েছে তোমাকে বলতেই হবে ভৈরবী। বল বল। বলতে বলতে আবেগে ভৈরবীর হাতটা চেপে ধরলো নবীন।

ভৈরবী সহজ ভাবেই বললো, রাস্তায় কেউ গেলে দেখতে পাবেক যে! তাইত! এ কী করছে নবীন! অবোধ মানুষের মত আচরণ করতে সুরু করেছে! ছিঃ ছিঃ ছিঃ! সে আপনার আচরণে নিজেই লজ্জিত হলো। অনুনয় করে বললো, মাপ্ করবে। আমার দোষ হঁয়েছে।

কোনো কথা বললো না ভৈরবী। বলতে পারলো না। বুক থেকে কান্না উঠে এসে জমা হয়েছিল কণ্ঠে। কথা বললেই ধরা পড়ে যাবে, তাই কিছু না বলেই আস্তে আস্তে চলে গেলো ভৈরবী।

নবীন যেমন দাঁড়িয়েছিল, তেমনি দাঁড়িয়ে থাকল খানিক, সমস্ত ঘটনাটার পিছনে কি কারণ থাকতে পারে—তাই ভাবলো, কিন্তু কোনো হদিশই করতে পারলো না। আপনার কাছে আপনাকেই অপরাধী বলে মনে হলো। একবার আকাশের পানে তাকালো—মহাপুরুষরা যেন তার দিকে তাকিয়ে হাসছে। দৃষ্টি নামালো নবীন, চোখের সামনে শূন্যে ভাসতে ভাসতে একটা ক্ষুদ্র জোনাকি পোকা চলে গেলো। এরা সবাই—আকাশের ওই তারা, হাওয়ায় ভেসে যাওয়া ক্ষুদ্র জোনাকি, যেন বলছে, আমাদের দেখ।

সারাটা রাত ঘুমুতে পারেনি নবীন। প্রভাতের অপেক্ষায় বসেছিল খাটিয়াটার উপর। বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রাত কাটিয়ে দিল নবীন। অন্ধকার—তার কাছে একটা নূতন তত্ত্ব নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল, বাইরে থেকে একে অন্ধকার মনে হলেও—এর একটা আলো আছে। নইলে মানুষ অন্ধকারে চলে কি করে? সব ভুলিয়ে দেয়। ভেদাভেদ জ্ঞান, কর্তব্যাকর্তব্য সব জ্ঞান লুপ্ত করে দেয়। সামনের আমগাছটায় কয়েকটা পাখী ডেকে উঠলো। নবীন বেরিয়ে এলো বাইরে—অন্ধকার কেটে একটু আলো ফুটেছে। রাস্তা চেনা যায়—না গেলেও ক্ষতি নেই। একদিন এই গ্রাম থেকেই নিরুদ্দেশের পথে পাড়ি দিয়েছিল নবীন, সেদিনও গ্রামের বাইরের রাস্তা চিনত না, তারপর পরিচিত হয়ে গিয়েছিল তার। খাটিয়া থেকে উঠে পড়লো নবীন। একতারাটি সঙ্গে নিলো। বেরিয়ে এলো বাইরে। রাস্তায় এসে দাঁড়ালো। একটা দীর্ঘশ্বাস নিলো নবীন—সে বাউল, পথেই তার ঘর। গ্রামের তে-মাথার মোড়ে আসতেই নবীনের দেখা হয়ে গেলো অর্জ্জুনের সঙ্গে। ভালোই হলো। যাবার সময় দেখা করা প্রয়োজন ছিল তার।

—এই সকালে ই দিকে যে? কুথাও যাইছ নাকি? অর্জ্জুন যাচ্ছিল ষ্টেশন-ডিউটিতে। নবীনকে দেখেই দাঁড়ালো।

—হাঁ।

—কুথাকে ?

—তার কি ঠিক আছে!

—সে কি হে, কুথাকে যাবে তার ঠিক নাই ?

—কি কৈরে বলি বল, যে দিকে তিনি লিয়ে যাবেন সেই দিকেই যাবো।

অধৈর্য হয়ে উঠলো অর্জ্জুন।

—উ সব তুমাদের বাঁধার কথা রাখ, সত্যি বল দেখি। ফিরবে কখন ?

—আর হয়ত ফিরব নাই।

—মানে ? ফিরবে নাই মানে ? কাল কথা হৈল আখড়া হবেক, আর সকাল হতেই বলছ ফিরবে নাই ?

নবীন কোনো কথা না বলে হাসলো।

—উ সোব হাসি তামাসা রাখ। আখড়া করতেই হবেক। তুমার মতলব ভালো লয়, চল ইষ্টিশনে। নবীনকে টেনে নিয়ে এলো অর্জ্জুন।

বড়োবাবু বদলি হয়ে এসেছে। নূতন লোক। কড়া লোক হিসাবে নামটা রয়ে গেছে। ইষ্টিশনের ষ্টাফ্ সন্ত্রস্ত থাকে। ঠিক সময় হাজিরা না দিলে সেদিন নাশ করে দেয় বড়োবাবু। তাই নবীনকে হরির দোকানে বসিয়ে দিয়ে একবার বড়োবাবুকে সেলাম করে এলো। হরি ব্যস্ত ছিল। সকালে ঠিক এই সময়েই একটা প্যাসেঞ্জার ট্রেণ আসে। জংশন ষ্টেশনে যায়। আশ পাশের গ্রামগুলি থেকে বহু যাত্রীতে সমাকীর্ণ হয়ে যায় ষ্টেশনের প্লাটফরম। জেলেদের মেয়েরা মাথায় করে ডালায় মাছ নিয়ে আসে, চাষী আনে আপনার ক্ষেতের ফসল—কয়েকটা ছেঁড়া অশথ পাতা বস্তায় পুরে নিয়ে যায় শহরে। গম গম করে ছোট ষ্টেশনটা। কিছুক্ষণের জন্য হাট বসে যায়। বিক্রী বাড়ে ষ্টেশনের দোকানগুলির। হরি এই খদ্দেরদের জন্যই একটা পাত্রে কিছু ব্যাসন গুলে পিঁয়াজী করছিল।

—হরিদাদা, বাউল চলে যাছিল হে, ধরে আন্যাছি। বললো অর্জ্জুন।

—বাউলরা কি আর এক জায়গায় থাকে রে। পালাঞ্ঞ যাবেকই ত।

—মা পালাতে দিব নাই। আখড়া খুলব হরিদাদা।

—টাকা ?

—প্যাসেঞ্জারদের কাছে মাগব দাদা।

—চাঁদা পঞ্চকত করবি। আমাদের যা দিতে বলবি দিব।

কিছুদিনের মধ্যেই আখড়া গড়ে উঠলো নবীনের। অর্জ্জুন গাঁয়ের বাউরীদের নিয়ে ভিৎ খুঁড়লো, দেয়াল তুললো। এর ওর ঘর থেকে খড় মেঙে এনে ছাদন করলো ঘরটা। বাঁশের বাখারি দিয়ে বেড়া দিল আখড়ার চারিদিকে।

—কি গো অর্জুনদাদা বলি তুমাদের আখড়া হৈল ? সেদিন আখড়ার জন্যই একটা মোটা শাল রোলা কাঁধে করে অর্জুন আসছিল কুলি রাস্তা দিয়ে, রাস্তাতেই ভৈরবীর সঙ্গে দেখা। ভৈরবী জিজ্ঞেস করলে, কোথায় যাইছ হে অর্জ্জুনদাদা। রোলা লিয়ে।

—আখড়ায়।

—শাল রোলায় কি হবেক ?

—গেট—গেট হবেক। দু পাশে থাকবেক। আখড়া প্রতিষ্টিটার দিনে যাস ভৈরবী। চলে যাচ্ছিল অর্জ্জুন।

—গেটের পাশে গাছ দিবে নাই ? তরুলতা গাছ ? গেটে এঁকে বেঁকে উঠবেক আর ছুটু ছুটু ফুল ফুটবেক।

মন্দ নয়, বেশ দেখাবে। শহরের অনেক ঘরেই এমনি গেট দেখেছে অর্জ্জুন। মনে মনে ভৈরবীর মতলবের তারিফ করলো সে। প্রকাশ্যে বললো, আরে, তারই জন্য ত গেট। সব আমার মাথায় আছে।

—আমার কাছে তরুলতা গাছ আছে। লিবে নাকি ?

—তাই দিস।

—কিন্তুক তুমাদের কিষ্ট ঠাকুর লিবেক ত !

একী কথা! কথাটার অর্থ কিছু উপলব্ধি করতে পারলো না অর্জ্জুন। কাঁধের বোঝাটা যন্ত্রণা দিচ্ছিল, তাই তখন তখন অত্যন্ত সংক্ষেপে একটা জবাব দিয়ে বললো, একদিন আসিস ভৈরবী।

—আখড়া পতিষ্ঠা হবেক ত ?

—নিশ্চয়। খাওয়ান-দাওয়ান, গায়েন-বাজনা, সারা রাত উৎসব হবেক।

বাড়ী এবং বেড়ার কাজ হয়ে গেলে অর্জ্জুন বললো, ইবারে উৎসব হবেক বাউল ঠাকুর।

—উ সোব আবার কেনে অর্জ্জুন।

তুমি কিছু জাননা বাউল ঠাকুর, এত বড়ো আখড়া করলুম-আর পাঁচ গাঁয়ের লোক জানবেক নাই। তুমি বাপু কথাটি কইওনা, আমি যা করি দেখে যাও।

—আমি বলছিলুম, ইয়ার তরে খরচ ত হবেক।

—হবেকই ত—তাই বলে পতিষ্টা হবেক নাই, না উৎসব হবেক নাই ?

রেগে গিয়েছিল অর্জ্জুন। মুখখানা কঠিন হয়ে উঠেছিল। হরিদাদা বলেছিল, অর্জ্জুন এমনিতে লোক খুব ভালো। রেগে গেলেই মানুষটা পাল্টে যায়। একবার নাকি রেগে গিয়ে মাষ্টার বাবুকেই মারতে গিয়েছিল অর্জ্জুন। শেষে সেই মামলায় অর্জ্জুনকে বসিয়ে রেখেছিল অনেক দিন। তবু পরোয়া নেই মানুষটার।

—বেশ যা ইচ্ছা তাই কর।

হলোও তাই। বাড়ী বাড়ী গিয়ে চাল সংগ্রহ করে আনলো। ইষ্টিশনের যাত্রীদের কাছে নগদ পয়সা আদায় করলো। দোকানদারদের কাছে ডাল তেল নুন, কিছু চাঁদা বাবদ আর কিছু কিনে নিয়ে এলো। ছোটবাবুর কাছ থেকে একটা তিরপলও আনলো অর্জ্জুন। সমস্ত যোগাড় হয়ে গেলে অর্জ্জুন নবীনকে জিজ্ঞেস করলো। এখন বল কাকে নিমন্তন্ন করতে হবেক ?

—তোমাদেরই উৎসব, তোমাদের যাকে খুশি, তাকেই করবে।

—তা ত করবই। তুমার কে কে আছে ?

আছে, তারও আপনার লোক আছে বৈকী। আছেন তাঁর গোঁসাইজী, পুত্রের অধিক স্নেহ করতেন। ডোমেদের সন্তান বলে কোনো দিন দূরে রাখেননি। আপনার স্নেহ দিয়ে জ্ঞান দিয়ে এবং সম্পদ দিয়ে নবীনকে গড়ে তুলেছেন গোঁসাইজী। সেই গোঁসাইজী

আছেন, আর গোঁসাইজীর আখড়ার সেবা দাসীরা আছে। মালিনী, খেঁদী, অত্যন্ত মুখরা আর স্পষ্টভাষিণী মালিনী, গুণও আছে—জমিয়ে রাখে আখড়াটিকে। হাসি-খুশি গাল-গল্প নিয়েই মেতে থাকে, ওকে না আনলে ও নানা কথা শুনিয়ে দিবে। আরো একটি লোককে মনে পড়লো নবীনের। ভৈরবী, যে কয়টা দিন ধর্মদাসের বাড়ীতে ছিল নবীন সেই দিনগুলিকে রাঙিয়ে তুলেছিল ভৈরবী। সেবায় যত্নে, কিনে আপনার করে নিয়েছিল। সেদিন রাত্রে কেন যে সে ওরূপ ব্যবহার করেছিল আজো তার কারণ নবীনের কাছে অজ্ঞাত। অনেকবার মনে হয়েছে, একটিবার জিজ্ঞেস করে আসে, কিন্তু পারেনি ; মন থেকে অন্য একজন কে বলে উঠেছে. না এ ঠিক নয়। ছেড়ে যখন এসেছিস তখন আর জড়িয়ে পড়িস না। নবীন বলেছে, আর ভয় কিসের। আমি বাউল। মনের লোকটি বলেছিল, বাউলও মানুষ নবীন। যে তোকে টানছে সে মায়া।

—মায়া যদি কায়া ধরে টানে, তার কাছে ধরা দেওয়া কি অপরাধ ?

—দুঃখ পাবি।

অর্জ্জুন নবীনকে নীরব থাকতে দেখে বললো, কি হে কও।

—আমি বলছিলাম, গাঁয়ের লোকদের বলবে নাই ?

—বলব, কিন্তুক ধম্মদাসকে লয়, তার ঘর বাদ।

—ক্যানে ? হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলো নবীন।

—সে আরেকদিন বলব।

—না আজই বল ভাই। অর্জ্জুনের হাত ধরে অনুরোধ করলো নবীন।

—শুনবে ? গাঁয়ের সবাই ত কিছু কিছু চাঁদা পঞ্চক দিয়েছে, কিন্তুক ওই ধম্মদাসের বৌ ? কিছু দেয় নাই, দু আঁটি খড় চাইতে গেলুম, ত কইলেক, অনেক খাওয়াইছি তুদের বাউলকে। উ আমার গোরুর খড়, দিব নাই।

—বেশ ওর বাড়ীতে ত আরো লোকজন আছে ?

—তারাও আর ভাল কি ? তুমি মনে কর কেউ জানে না নাকি ? সেদিন রাতে তুমাকে খেদা (তাড়িয়ে দেওয়া) দিলেক ভৈরবী, সে কথা

কেউ জানে না নাকি ? দেখুক উয়ারা আমরা তুমাকে রাখতে পারি কি না। নিমন্তন্ন আমি কৈরব নাই, তবে হাঁ, যদি গায়েন শুনতে আসে আসবেক।

অর্জ্জুনকে চটানো ঠিক নয়। মানুষটা একরোখা। যেটি বলবে সেটি করবে। বাধা দিলে জেদ আরো চড়ে যায় তার।

রসুই করবার জন্য ইষ্টিশন থেকে পানি পাঁড়েকে নিয়ে এসেছিল অর্জ্জুন। পানি পাঁড়ে ভালো জাত—গলায় পৈতে আছে। ইষ্টিশনের বাবুদিকে নিমন্ত্রণ করে এসেছিল। বাইরের যোগাড় করে দিয়েছিল অর্জ্জুন, হরি দাদা তদারক করেছিল রান্নার, আর নবীনের উপর দায়িত্ব ছিল, সান্ধ্য অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করবার। উঠানের তিরপল ঢাকা জায়গাটায় বাউল গান হবে।

সন্ধ্যা হতেই খাওয়া সুরু হবে বলে কয়েকটা হ্যাসাক বাতি নিয়ে এসেছিল অর্জ্জুন।

সমারোহ করেই খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকলে নবীন নামলো আসরে। গোঁসাইজীর আখড়া থেকে কয়েক জনকে এনেছে নবীন। বীরভূম থেকেও কেউ কেউ এসেছে। গান জমবে ভালো।

অর্জ্জুন একবার এসে বলে গেলো, ভালে করে গাইতে হবেক বাউল।

ঘরের বাইরের চালায় বসে নবীন একতারার সুর বাঁধছিল, ঘরের মধ্যে ছিল মালিনী খেঁদী আর রাধা। গোঁসাইজী পাঠিয়ে দিয়েছেন। মাধব আর গৌরাঙ্গদাস এসেছেন বীরভূম থেকে।

মালিনী আঁচলে এক রাশ ফুল নিয়ে মালা গাঁথতে গাঁথতে বললো, সে আর বলতে হবেক নাই। রসের জোগানদার থাকলে, আপনিই সুর উঠে ঠাকুর।

অর্জ্জুন মালিনীর কথায় জবাবে বললো, জোগানদার আর কই গো।

—আছে হে, আছে—সাথে লিয়েই আস্যাছি। ওই দেখ।

রাধাকে দেখিয়ে দিল মালিনী। রাধার মুখ খানা লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠলো। সত্যই রাধা দেখতে ভালো। বয়সটাও অনেক কাঁচা। এই লাইনে বোধ হয় নতুন এসেছে সে, তাই এখনো জড়তা কাটেনি।

—কি লো রাধা, পারবি নাই রসের জোগান দিতে ?

—আঃ, তুমি কি যে বল দিদি।

—ওমা ছুঁড়ির আবার লাজ লাগছে ; বলি ই পথে আস্তাছিস ক্যানে ?

এর কোনো জবাব দিল না রাধা।

অর্জ্জুনের ডাক পড়লো বাইরে। অর্জ্জুন উঠে যাবে এমন সময় মালিনী তাকে ধরে বসিয়ে বললো, তুমাকে ভাই একটা ফয়শালা করে দিয়ে যাত্যা হবেক।

—কি বল।

—এই যে মালা গাঁথছি, ই মালা কে দিবেক নবীন বাউলকে।

—না হয় তুমিই দিবে।

—ওমা এ বলে কি গো, বলি আমাদের কি সে বয়স আছে ।

—বেশ, তবে তুমি যাকে বলবে সেই দিবেক।

—আমার কথা শুনে কই ?

গৌরাঙ্গ দাস যত্ন সহকারে চূড়া বাঁধছিল এতক্ষণ। চূড়া বাঁধা হয়ে গেলে রসকলি টেনে এসে উপস্থিত হলো মালিনীর কাছে।

—তুমার কথায় গোঁসাইজীর আখড়া চলে, আর এখানে তুমার কথা চলবে না, এ কী হয় দিদি।

—কে সেবাদাস নাকি ?

—সেবাদাস ? অর্জ্জুন জিজ্ঞেস করলো।

—ওমা তা জাননা, আমরা সেবাদাসী আর ওঁরা সেবাদাস। তা ভাই সেবাদাস তুমিই না হয় বলে দাও। আমি বলি রাধা দিক। হেসে উঠলো গৌরাঙ্গদাস। —রাধা ছাড়া কারই বা অধিকার আছে বল। রাধা উঠে যাচ্ছিল। মালিনী বললো, ওমা উঠে যাস কুথা লো।

—আমার কাজ আছে দিদি! চলে গেল রাধা।

অর্জ্জুন বললো, তোমরা বড়ো দুষ্টু !

—দুষ্টু নয় কে সখা ? অমন যে কৃষ্ণ ঠাকুর সেই কি কম দুষ্টু ছিল।

খাওয়া চুকে গেছে। এবার গান। প্রথমে হবে মাধবের। মাধবের বয়স হয়েছে—বেশী রাত জাগলে আবার কাশি হয়, তার কফা ধাত।

সন্ধ্যা রাতেই সেরে দেওয়া ভালো। তারপর গৌরাঙ্গদাস—সর্বশেষ নামবে নবীন।

আজই প্রথম নবীন প্রকাশ্য আসরে নেমে গান গাইবে। প্রচুর জনসমাগম হয়েছে। আসর গমগম করছে। একদিকে পুরুষরা, একদিকে মেয়েরা বসে আছে। ইষ্টিশনের বাবুরাও এসেছেন। আসর দেখে গা ছম্ ছম্ করছে নবীনের। কে জানে যদি এদের মনোরঞ্জন করতে না পারে সে! একবার গুরুকে স্মরণ করলো সে। মনে মনে আসরের শ্রোতাদের প্রণাম জানালো। আসর নারায়ণ। ক্ষণকালের জন্য হলেও—এই আসর তীর্থ ক্ষেত্র। অর্জ্জুন এসে বলে গেলো, ইবারে তুমার পালা বাউল ঠাকুর। বাজী মাৎ তুমাকেই করতে হবেক। গাঁয়ের প্রায় সবাই আস্যাছে।

এক ইচ্ছা হলো জিজ্ঞেস করে ধর্মদাসদের ঘরের কেউ এসেছে কি না। ভৈরবী গান ভালোবাসে। বাউলের কাছে গান শুনতে চেয়েছিল সে। শুনিয়েছিল নবীন। কিন্তু তাতে তৃপ্তি হয়নি ভৈরবীর। বাউলরা যেমন নেচে নেচে গান গায় একতারা নিয়ে, তেমনি করে গাইতে বলেছিল নবীনকে। নবীন শোনাবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, কিন্তু—

—ওই ত ধম্মদাস ত, তুমার অত আপনার লোক, তা বলতে গেলুম, গায়েন শুনতে যাবে হে খুড়া। জবাব কি দিল, জান?

—কি? জিজ্ঞেস করলো নবীন।

—বল্লেক, আমরা আর অত পুণ্যি কৈরেছি কই অর্জ্জুন?

—উয়ারা তবে আসে নাই?

—না। ধম্মদাস গেল শালতোড়ায়। আটেস্‌টেশেনের ক্যাম্ পড়েছে। বিষ্টু মড়ল নিয়ে গেইছে উয়াকে।

—ক্যানে?

—সে পরে শুনবে। বিষ্টুর পেশাই হৈল পরের জমি আত্মসাৎ করা। আটেস্‌টেশেনের বাবুদিকে সন্তুষ্ট কৈরে কারু জমি লিজের নামে রেকর্ড করাবার মতলব, সে অনেক ইতিহাস আছে, পরে কইব।

ধম্মদাসের বাড়ী থাক্যা তবে কেউ আসে নাই?

—আইলে আসবেক ঘর জামাই। দেখি নাই। এখন চল আসরে। আসর ফাঁকা গেলে চলবেক নাই।

না, তা চলবে না। আগামী দিনের নবীনের জীবনধারার ইতিহাস আজই প্রথম লিখিত হবে। নবীন মাথার চুলগুলি আঁচড়ে নিয়ে চূড়া করে বাঁধলো। গায়ে গৈরিক আলখাল্লা, পায়ে নূপুর, হাতে একতারা, কোমরে ঢুগী।

মালিনী একটা ফুলের মালা নিয়ে এসে বললো, আমার দোষ নাই ছোট গুঁসাই, কিছুতেই রাজী হলো নাই রাধা, তাই আমিই লিয়ে আস্যাছি।

—কি নিয়ে এসেছ ভাই ?

—এই যে, মালাটা দেখিয়ে দিয়ে বললো, এটা নিজেই পরে লাও —আমার পরাঞ দেওয়া ভাল দেখায় না। ছুড়ি লাজেই ম'লো।

গোঁসাইজীর আখড়ায় নবীন যখন ছিল, তখন রাধা আসেনি, কাজেই রাধার সঙ্গে পরিচয় নেই নবীনের। এখানে আসার পর সামান্য কাজের কথা দু চারটা হয়েছে। নবীন দেখেছে রাধা দূরে দূরে সরে সরে থাকতে চায়, কাজেই তাকে আর বিরক্ত করেনি নবীন। নবীন মালিনীর হাত থেকে মালাটা নিয়ে গলায় দিল।

—আহা, ঠিক যেমন কিষ্ট ঠাকুরটি।

কিষ্ট ঠাকুর বলতেই আবার একবার মনে পড়ে গেলো ভৈরবীকে। আজ জীবনের পরম মুহূর্তে ভৈরবী অনুপস্থিত। ঠিক জানে না, কেন এমন করে তার অনুপস্থিতিটুকু নবীনের বুকে বাজলো। —একা একা আসরে যাবে, তার চেয়ে রাধাকে সাথে লাও না ছোট গুঁসাই। মন্দ হয় না। মাঝে মাঝে একটু বিশ্রাম নেওয়ার জন্যও একজনকে প্রয়োজন।

সে বললো, রাধা কি আর রাজী হবেক !

—হবেক নাই ক্যানে ? বড় গুঁসাই বলে দিয়েছে, দেখিস মালিনী যেমন আসরের মান থাকে। তুমি কইলেই গাইবে।

নবীন তাকিয়ে দেখলো, আনত মুখে বসে আছে রাধা। যেন দীর্ঘ মৃণালের উপর আধ ফোঁটা একটি শতদল আছে নুয়ে।

—আমি ডাকে দিছি, তুমি বল, ছুড়ির গলা বড়ো মিঠা! ওলো, ও রাধে, দ্যাখ্ ছোট গুসাই কি কইছে। রাধা আস্তে আস্তে এগিয়ে

এলো। নবীন প্রস্তাব করলো তার সঙ্গে আসরে নামতে। আপত্তি করলো না রাধা।

আসরে এসে দাঁড়ালো নবীন। আকাশে উঠেছে চতুর্দশীর চাঁদ। দিগন্ত বিশারী প্রান্তরের গায়ে ঝরে পড়েছে জ্যোৎস্নার কিরণ মালা। অসীম স্তব্ধতা বিরাজিত চারিদিকে। নদীর বালুরাশি স্পর্শ করে বয়ে আসছে শিহরণ জাগানো বাতাস। নবীনের মন বলে উঠল, সুন্দর, সুন্দর—এই আকাশ, এই পৃথিবী, এই হাওয়া, এই রাত্রি, এই মানুষ—সব তার চোখে সুন্দর হয়ে ধরা দিল। নবীনের অনুসন্ধিৎসু মন একবার শ্রোতৃমণ্ডলীকে দেখে নিলো—যদি ওদের মধ্যে কোথাও লুকিয়ে থাকে তার মনের শ্রোতাটি! না, দেখতে পেলো না। অর্জ্জুন অনতিদূরে দাঁড়িয়ে আছে। সে ঈশারায় বললো, এবার আরম্ভ হোক্।

নবীনের আঙুলের পরশ পেয়ে বেজে উঠলো একতারা। নবীন গাইলো—

সমাগত মধু মাস
না আয়ল পীতবাস
চিতে মদন বিকাশ
তনু শিহরে
নব ফুলে অলিকুল
মাতি গুঞ্জরে।

পায়ের নূপুর তালে তালে উঠল বেজে। রাধার হাতের মন্দিরা যান্ত্রিক শব্দ করে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে রাধা গাইলো,—

হরি বিনা বৃন্দাবনে
(এলো) বসন্ত কি প্রয়োজনে
ভব প্রীতা ভাবে মনে
শ্যাম নাগরে॥

ক্লান্তি নেই নবীনের। একটার পর একটা গান গেয়ে চললো নবীন, শ্রোতৃমণ্ডলী মুগ্ধ চিত্তে শুনলো। গান সমাপ্ত হলে অর্জ্জুন নবীনকে জড়িয়ে ধরে বললো, মুখ রাখ্যাছো বাউল ঠাকুর।

উৎসব হয়ে যাওয়ার পরও দিন কয়েক থেকে গেলো মাধব, মালিনী

রাধা খেঁদীও থাক্‌ল। একটা পুরো সংসার নবীনের। অর্জ্জুন ডিউটি করে এদিকে আসে। থেকে যায় খানিক সময়। মালিনীর সঙ্গে গল্প ক'রে সময় কাটায়।

মালিনী ঠাট্টা ক'রে বলে, তুমি ত ভাই গোঁজা রলা।

যে ঘরের ছাদন নষ্ট হয়ে যায়, অথচ কাঠামো ঠিক থাকে সেই ঘরের চালটাকে ঠিক রাখতে হলে চালের নীচে রলা গুঁজে দেওয়ার একটা পদ্ধতি পল্লীগ্রামে আছে।

অর্জ্জুন কথাটা শুনে রাগ ত করলোই না বরং হাসলো।

অর্জ্জুন বললো, তবু ত তোমাদের সাথে একটা সম্বন্ধ পাতানো হলো।

—কিন্তুক ভাই, আমাদিকে আর কত দিন এখানে আটকে রাখবে ?

—আস্যাছ যখন তখন ছুটো দিন থাকেই যাও।

—থাকলে তুমাদেরই ক্ষেতি হবেক ভাই, শেষে যদি মন বসে যায় তখন তাড়াঞ দিলেও আর যাব নাই। ওলো, ও রাধী, একটু চা করে দেলো! একটু চা খেয়ে যাও ভাই।

—একা ত আমি খালে হবেক নাই, বাইরে আরো দু জন আছে যে—তার চেয়ে চা থাক্।

—তাই কি হয়, কালকে ত তুমিই চিনি আন্যা দিয়েছ ভাই, সব ঠিক আছে, নাই কেবল দুধ। তা না হয়—বিনা দুধেই হবেক। বলি, রুচবেক ত।

উৎসবের তিন দিনের দিন মাধব বললো, এবারে আমাদের বিদায় দাও নবীন ভাই।

নবীনের জীবনে এমন সুখের দিন আসেনি কখনো। মালিনীর কল্যাণে প্রতিটি জিনিস না চাইতেই হাতের কাছে এগিয়ে আসে। যেটুকু যত্ন পাচ্ছে সে, এ রকম যত্নও কোনো দিন পায়নি নবীন, এমন আনন্দও কোনো দিন তার কপালে জুটেনি।

নবীন বিনীত ভাবে বললো, বিদায় কি আর দেওয়া যায় দাদা। আবার কখন আসবে তার কি ঠিক আছে।

—আসব নবীন, নিশ্চয় আসব, বললো মাধব।

মালিনী কাছেই দাঁড়িয়েছিল, সে আস্তে আস্তে বললো, আমাদের

কিন্তুক আর ফিরে যাবার ইচ্ছা নাই ছোট গুসাই।

—ক্যানে জায়গাটায় কি মায়া বসে গেছে মালিনী?

জিজ্ঞেস করলো মাধব।

—বসবারই ত কথা মাধব ঠাকুর। তাছাড়া—বলতে গিয়ে কথাটা না বলে চুপ করে গেলো মালিনী।

—তাছাড়া কি মালিনী? জিজ্ঞেস করলো মাধব।

—বলছিলাম আমরা যেতে চাইলেও আরো একজন যেতে চাইবে কেন?

—সে কে?

—আছে গো আছে।

—বলই না শুনি। বললো নবীন।

—যাকে তুমার দরকার গানের আসরে। ছুড়ি যে মরেছে।

নবীন বুঝলো—মালিনী রাধার কথা বলছে। রাধা মেয়েটিকে দেখতে হয় না, দৃষ্টি টেনে নিয়ে যায়। প্রথম যেদিন এলো সেদিনও যেমন তাকে নীরব দেখেছিল আজো তেমনি দেখছে। আখড়ার সমস্ত কাজের দায়িত্বই সে তুলে নিয়েছে আপনার মাথায়। নবীনের সুখ সুবিধার দিকে বিশেষ নজর যে একজনের আছে তা বুঝেছিল নবীন, কিন্তু সেই বিশেষ জন যে রাধা তা জানত না। তবে কি রাধা, তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে? যদি তাই হয় তাহলে তা বিপদের কথা বইকি।

একদিন কথায় কথায় মালিনী বলেছিল, ও এই পথে নোতুন এসেছে কিনা? বড়ো ঘা খেয়েছে মেয়েটা। ভালো ঘরের মেয়ে গো, অল্প বয়সে বিধবা হলো, কিন্তু মন বা প্রবৃত্তি ত নষ্ট হয়নি, প্রলোভনে পড়ে মন দিল একজনকে। সর্বস্ব দিল, তার পরিবর্তে পেলো—নিন্দা, ঘৃণা। সমাজের যন্ত্রণা সইতে না পেরেই এ পথে চলে এসেছে রাধা। তাই ও চুপ করে থাকে।

—মরেছি আমরা সবাই,—বললো মাধব, এখানে আর আমাদের ধরে রেখোনা নবীন।

নবীন মত দিলো।

পরের দিন থেকে, তার পরের দিন যাবার আয়োজন করলো

ওরা। আয়োজন আর কি – একটা করে থলি। থলির মধ্যেই ছোট্ট আয়না, একটা চিরুণী, কিছুটা চন্দন কাঠ, একটুখানি গঙ্গামাটি। সবাই সাজ গোছ ক'রে বসে থাকল, অর্জ্জুন বলেছে সে এসে নিয়ে যাবে তাদের। গাড়ীতে চড়িয়ে দিবে।

সবাই অর্জ্জুনের অপেক্ষায় বসে আছে, এমন সময় খেঁদী এসে নবীনকে ডেকে নিয়ে গেল ভিতরে।

নবীন যেতেই রাধা উঠে দাঁড়ালো।

—কিছু বলছিলে? জিজ্ঞেস করলো নবীন খেঁদীকে।

—আমি নই, ও। খেঁদী রাধাকে দেখিয়ে দিয়ে চলে গেল।

—বল কি বলছিলে রাধা! বললো নবীন।

—বাইরে মালিনী দিদির কাছে আমার লজ্জা করে, তাই এখানে ডেকেছি।

—লজ্জা কেনে? মালিনী ত ভালো মানুষ রাধা।

—ও বড়ো ঠাট্টা করে তোমাকে নিয়ে, তাই বলছিলাম, তুমি কিছু মনে করোনা।

নবীন হাসবে না দুঃখ করবে কিছু বুঝতে পারলে না। সে রাধাকে বললো, না কিছু মনে করি নাই। কিন্তু তুমি বলত রাধা, তুমি অমন চুপ-চাপ থাকো কেন?

—ঠাকুর আমাকে অমনি রাখেন যে। যাক্ তোমার এখানে উৎসব হলে আবার আমাদের আনবে ত!

—আনব বৈ কী, তোমরা না এলে আমার উৎসব জমবে কেন?

—গোঁসাইজীর জন্মোৎসব হবে এবার, তুমি যাবে ত!

—নিশ্চয় যাবো। গোঁসাইজীর জন্মোৎসবে যাব না?

এই সময়েই বাইরের থেকে মালিনী হাঁক্ দিলো, ও রাধারাণী এবার এসো। অর্জ্জুন ভাই এসেছে।

নবীন বললো, এবার উঠে এসো রাধা।

নবীন চলে আসবার জন্য ফিরতেই রাধা অকস্মাৎ তার চরণ স্পর্শ করে একটা প্রণাম করলো। আশ্চর্য হলো নবীন। সে বললো, এ কী করলে রাধা। তুমি আমার চেয়ে উচ্চ বংশে জন্মেছ, আর জাতিতেও—

—আমরা যে লাইনে এসেছি, এখানে ত জাতির বিচার নেই ঠাকুর। বংশের উচ্চতা নীচতার নাম নিয়ে ত সাধনার ফল পাওয়া যায় না।

—কিন্তু তুমি আমাকে প্রণাম করলে কেন?

এর কোনো জবাব দিল না রাধা। জবাব দেবার মত বুদ্ধিও তার নেই, সে বললো, মনে হলো তাই।

বাইরে অপেক্ষা করছে অর্জ্জুন। যাত্রার সময় হয়ে এসেছে। একটু আগেই বেরুনো প্রয়োজন। মেয়েদের চলন—ঢিমে তেতালে যাবে, ইষ্টিশনে পৌছাতে দেরী হবে বৈকী, কাজেই একটু আগে গিয়ে ইষ্টিশনে বসে থাকলেও ক্ষতি নেই। অর্জ্জুন তাড়া দিল।

প্রস্তুত হয়েই ছিল মালিনী। সে একবার তার দলের সবাইকে তাড়া দিয়ে বললো, কই লো রাধা, খেঁদী—আয় বাছা।

সবাই বেরিয়ে এলো বাইরে। যথারীতি বিদায় পর্ব সমাধা হলো। মালিনী নবীনকে বললে, তোমার আখড়ার নাম ব্রজধাম থাকল ছোট গুঁসাই!

—বা বেশ নাম।

নবীন এলো ষ্টেশনে ওদের তুলে দিতে। ট্রেণ আসার দেরী ছিল। প্রতীক্ষালয় একটা আছে বটে, কিন্তু সেখানে কাকেও রাখা যায় না। জায়গাটা ফাঁকা। কাঠের জাফরি দেওয়া একদিকে। ইদানীং সিমেণ্টের বাঁধাই দুটো বেঞ্চ করে দিয়েছে। যারা সব ষ্টেশনে গাড়ী ধরতে আসে তারা ইষ্টিশনের দোকানগুলোতেই সময় কাটিয়ে দেয়, মেয়েছেলে থাকলে হয় তারা প্লাটফরমের এক পাশে বসে সময় কাটায়, নয় পরিচিত হলে হরির দোকানের ভিতর একটা জায়গা অধিকার ক'রে থাকে। অর্জ্জুন মেয়েদের হরির দোকানে রেখে দিয়ে গেল ইষ্টিশনে।

—তুমরা এই ঠ্যানেই থাকো, আমি ঠিক সময়ে আসে লিয়ে যাব। ইয়ারা থাকল হে হরিদাদা!

হরি ওদের মান্য করেছিল। চা করে খাইয়েছিল সবাইকে। পয়সা নেয়নি, পাশে বসেছিল নবীন। দৃষ্টি তার অন্তর্মুখী। কি যেন ভাবছে নবীন গভীর ভাবে।

মালিনী প্রশ্ন করলো, ছোট গুঁসাই কি ভাবছেন গো!

চমকে উঠলো নবীন। বললো, সে রকম কিছু না। ভাবছি আজ ব্রজধাম ফাঁকা হয়ে গেল।

নবীনের কানের কাছে চুপি চুপি মালিনী বললো, মন টিকবেক ত!

—প্রথম প্রথম দিন কয়েক ফাঁকা ফাঁকা লাগবেক বৈকী, তারপর টিকে যাবেক। এই ক'টা দিন খুব জ্বালালুম তুমাদের। মনে থাকবেক।

—আমরা হয়ত ভুলে যাব ছোট গুঁসাই, কিন্তুক—যে ভুলবেক নাই, সে এখুনি কাঁদছে। চেয়ে দেখ রাধার দিকে।

রাধার দিকে তাকাতেই চোখ নামিয়ে নিল রাধা। ওর ডাগর ডাগর চোখে সত্যই যেন বেদনা ফুটে বেরুচ্ছে। বিষাদের ছায়া রাধার মুখের উপর, কিন্তু কেমন যেন একটি পবিত্র ভাব। আকর্ষণ করে, কিন্তু স্পর্শ করতে সাহস হয় না। ও যেন একটি ফোটা ফুল। বেদনার মধ্য দিয়ে ওর জন্ম, ওর পাপড়ির মধ্যে লুকিয়ে আছে হয়ত কীট, তবু ও দেবতার চরণে স্থান পাবার যোগ্যা।

—মনে ধরেছে নাকি ছোট গুঁসাই? চুপি চুপি জিজ্ঞেস করলো মালিনী।

একটা জবাব দিতে যাচ্ছিল নবীন, ঠিক এমনি সময়ে ট্রেণ আসার ঘণ্টা পড়লো। টিকিট করার তাগিদ নেই, সে কাজ অর্জ্জুনই করবে, তবু চঞ্চল হয়ে উঠলো বাউলদের দলটি। উঠে পড়লো তারা। এক পা এক পা ক'রে এগিয়ে যেতে লাগলো প্লাটফরমের দিকে। মালিনীর পাশেই ছিল নবীন, পিছনের সারিতে খেঁদী আর রাধা। মালিনী চুপি চুপি বললো, যেও ভাই।

—সময় পাই যদি—

—এই ত তোমার দোষ ছোট গুঁসাই, এখানে তোমার অভাবে কি কাজ আছে যে পড়ে থাকবে শুনি।

আছে, কাজ আছে নবীনের। উৎসবের মধ্যে একদিন বি, ডি, ও, সাহেব ডেকে পাঠিয়েছিলেন—জমিটা রেজিষ্ট্রি করে দেবার জন্য। নবীন বলেছিল উৎসব শেষ হলে যাবে। কালকেই দেখা করতে হবে সাহেবের সাথে। পাঠশালাটা গ্রামে যদি হয়—হয়ে যাক্, অনেকেই লেখাপড়া

শিখতে পাবে। তারপরে পাঠশালাটার জন্য কিছু পয়সাও তুলে দিতে হবে। তা দিবে নবীন।

—আশ্রম প্রতিষ্ঠা ত হৈল, ইবারে শিক্ষাশ্রম প্রতিষ্ঠা বাকী আছে যে।

ঠিক সময়েই গাড়ী এলো। একটা ছোট্ট কামরায় তাদের উঠিয়ে দিল অর্জ্জুন।

—আমাদের টিকিট্ কই হে সখা! অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করে বললো মালিনী।

—সে তুমাদের ভাবনা নাই গো। কেউ চাইলে আমার নাম কৈরে দিও। আর চাইবেক নাই। ই লাইনের সব চেকারই আমার চেনা।

কিন্তু যাই হোক কাজটা ভালো হলো না। অর্জ্জুনের এই কাজকে সমর্থন করতে পারলো না নবীন। বিনা টিকিটে যাওয়া ভালো নয়। পথে যদি কোনো আপৎ হয়। অনেক চেকারকে যাত্রীর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করতে দেখেছে নবীন। অনেক গল্পও শুনেছে। ট্রেণ থেকে নাকি টিকিট না থাকার অপরাধে বাইরে ঠেলে দিয়েছে অনেক চেকার। সে রকম যদি একটা কিছু হয়। নবীনের শ্রদ্ধাভাজন অতিথি তারা, ওদের অপমান করলে, নবীনই অপমানিত হবে। নবীন অর্জ্জুনকে বললো, আমি টাকা দিচ্ছি, তুমি উয়াদের টিকিট করে দাও।

—আরে রাখ তুমার টাকা! চল তুমার ছামুতেই বলে দিই। নবীনকে টেনে নিয়ে গেল অর্জ্জুন, একটি চেকারের কাছে নমস্কার করে দাঁড়ালো।

চেকারবাবু বললেন, বুঝেছি হে!

অর্জ্জুন মাথা চুলকিয়ে বললো, আপনি থাকতে যদি টিকিট করে আমাদের লোক-জনদের যেতে হয় স্যার—

—কে যাচ্ছে।

—আমাদেরই লোক, ওই কামরায় আছে। চারজন। বেশী দূর যাবেক নাই। তিনটা ইষ্টিশনের পরেই নামে পড়বেক।

—আচ্ছা ঠিক আছে।

অর্জ্জুন ছাড়বার ঘণ্টা দিতে গেল, নবীন গেলো মালিনীদের কামরাটার কাছে। ভিতরে খেঁদী। ঠিক জানালাটার কাছেই রাধা। রাধা আনমনে তাকিয়েছিল প্লাটফরমের দিকে। রাধার কাছে যেতেই ট্রেণ ছেড়ে দিল। মালিনী মুখ বাড়িয়ে বললো, ছোট গুঁসাই ইবারে যাবে গো! মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো নবীন।

রাধা যেমন তাকিয়ে ছিল, তেমনি তাকিয়ে থাকলো, নবীন হাত নেড়ে বিদায় দিল রাধাকে। রাধা জানালার বাইরে মাথাটা বাড়িয়ে একবার চেষ্টা করে নবীনকে দেখবার জন্য। প্লাটফরমটা অদৃশ্য না হওয়া পর্যন্ত তেমনি অবস্থাতেই ছিল রাধা।

আখড়ায় ফিরে এলো নবীন।

আখড়ায় ঢুকতেই একটা বেদনা বোধ করলো নবীন। আখড়া ফাঁকা। এই কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত এই জায়গাটাই কলরব মুখরিত ছিল। যাদের বিদায় দিয়ে এলো, তাদের অভাবটাই দারুণ ভাবে অনুভব করলো নবীন। হাসি তামাসায়, গানে বেশ ভরে ছিল। এখন এই মুহূর্তে মনে হলো সব যেন হারিয়ে গেছে। চারিদিকে ভীতি জন্মানো নির্জনতা, তার মাঝে আজ নবীন একা। সামনে পিছনে বিশাল প্রান্তর, এক পাশে নদীর বালুরাশি। উঁচু নীচু অসমতল মাঠ। কেউ কথা কইছে না! এই অসীম নীরবতার মধ্যে বিচ্ছেদ বেদনাটা আরো গভীর হয়ে বসলো নবীনের অন্তরে। ওই প্রান্তরের মত তার হৃদয়ও যেন আজ শূন্য। কার একটা অভাব অনুভব করছে নবীন। অথচ এ অনুভূতিও তার পক্ষে শোভন নয়। সে বাউল, মানুষের কল্যাণের জন্য জীবন তার উৎসর্গীকৃত। এখানে নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, আপনার সঙ্গীর প্রয়োজন কি? এই প্রান্তর, ওই নদী—ওই আকাশও যা, সেও তা।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো একটু একটু করে। আকাশের গায়ে ফুটে উঠলো মহর্ষির দল আর সাত ভাই চম্পা, প্রান্তরের এক এক প্রান্ত থেকে ডেকে উঠলো একটা শেয়াল, কয়েকজন মানুষ কথা বলতে বলতে আশ্রমের পিছন দিকের চলা রাস্তা দিয়ে চলে গেল। নবীনের ইচ্ছা হলোনা আখড়ার ভিতরে গিয়ে কেরোসিনের আলোটা জ্বেলে নিয়ে আসে। যেমন বসেছিল, তেমনি বসেই থাকলো। সে দিনও এমনি

অন্ধকারে ধর্মদাসের বাইরের ঘরটায় বসে রাত কাটিয়ে দিয়েছিল নবীন। মনে ছিল এমনি চিন্তার ঝড়। আসবার সময়ও ভৈরবীকে ডাকেনি নবীন।

ভৈরবীর কথা আজ অনেকদিন পরে মনে হলো তার। মনে হলো তাকে অনেক দিন দেখেনি নবীন। ক্ষিদের কথা যতক্ষণ ভুলে থাকা যায়, ততক্ষণ ক্ষিদে পায় না, যে মুহূর্তে তার কথা মনে আসে ঠিক সেই মুহূর্তে ব্রহ্মাণ্ডকে উদরে স্থান দেবার ক্ষিদে জাগে। এও যেন তেমনি। ভালোই ছিল নবীন—ভৈরবীকে ভুলে ছিল! আজ মনে হতেই একটিবার তাকে চোখের দেখা দেখবার জন্য অস্থির হয়ে উঠলো নবীন। অনেক আশা করেছিল, তার এই আশ্রম প্রতিষ্ঠার কাজে ভৈরবী এগিয়ে আসবে সকলের আগে। কিছু না করলেও গান শুনবে, নবীনের গান বড়ো ভালোবাসে ভৈরবী। মনের সাধ মিটিয়ে গান শোনাবে তাকে। গান গেয়েছে নবীন, কিন্তু তার অন্তর তৃপ্ত হয়নি। যারা এসেছিল, তারা প্রশংসা করে গেছে, কিন্তু এতেও খুশি হতে পারেনি নবীন। পরিশ্রান্ত ছিল নবীন। কোনো কাজ হাতে না থাকলে শ্রান্তি আরো পেয়ে বসে। ছোট ছোট যে কাজ আছে, তা না করলেও ক্ষতি নেই। ভৈরবীর কথা ভাবতে ভাবতেই কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল নবীন। ঘুম ভাঙলো পাখীর ডাকে।

উঠে বসল নবীন। তখনো ভালো করে পরিষ্কার হয়নি চারিদিক। বসে বসে খানিক গুণ গুণ করে গাইলো নবীন সেই বহুকালের পুরোনো সঙ্গীত—"রাই জাগো, রাই জাগো বলে শুক ও সারী ডাকে।" আহা বড়ো মিঠা সুর! ভৈরবী রাগিণী। বার বার গাইলো নবীন। চোখ দুটো তার সামনের পায়ে-চলা রাস্তাটার উপর। দু-চারজন রাখাল গোরু নিয়ে ওই পথে গেল, আস্তে আস্তে উঠে পড়লো নবীন। সকালে স্নান করেই বেড়িয়ে পড়বে সে।

স্নান করবার জন্যই নদীর ঘাটে এলো সে। পরাণ ডুবার ঘাট। ও পারের ছোট্ট পল্লীর মানুষ ছিল পরাণ জেলে। নদীতে মাছ ধরত, প্রবল বন্যায় নদীর পিঙ্গল জলস্রোতে ঝাঁপিয়ে নদীর মুঠো থেকে ছিনিয়ে আনতো ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়া মোটা মোটা গাছের গুঁড়ি। হার মানত

দুরন্ত নদী। পাড়ে উঠে এসে ব্যাঙ্গাত্মক দৃষ্টি হেনে মনে মনে নদীকে বলত, গরীবের কুঁড়েই তুই ভাসাতে পারিস! বন্যা-রঙ্গিণী নদী হেসে উঠত পরাণের কথা শুনে। ঢেউয়ে ঢেউয়ে বলে যেত—এ অপমান সইবোনারে পরাণ। পরাণ বলত, কি করবি?

—তোকেও এক দিন ভাসিয়ে নিয়ে যাবো সাগর সঙ্গমে।

পরাণ আর জবাব না দিয়ে দুষ্টু ছেলের মত একটা পাথর ছুঁড়ে মারত নদীকে। এক দিন সত্যসত্যই প্রতিশোধ নিয়েছিল নদী। সে বছর ঠিক দুর্গা পুজোর সময় প্রচণ্ড বান এসেছিল নদীতে। পরাণ নৌকা বইত বানে। শ' খানেক যাত্রী নিয়ে তার ছোট্ট নৌকাটা ভাসিয়ে দিয়েছিল নদীর জলে। কিছু দূর এগিয়ে যেতেই, স্রোতের প্রবল টানে হালের দড়ি গেল ছিঁড়ে। হায় হায় করে উঠেছিল যাত্রীরা। পরাণ বলেছিল, ডরাবেন নাই গো মেয়েছেলেরা, হরি হরি বল। যাত্রীরা কাতর ভাবে বলে উঠেছিল, আমাদের বাঁচাও পরাণ।

—ডরাবেন নাই, হরি বল সব—বল হরি, হরিবোল। শক্ত হাতে দাঁড় ধরে প্রবল স্রোতের বিপরীতে কোনো উপায়ে নৌকাটাকে ঠিক রেখেছিল পরাণ। ছলাৎ ছলাৎ করে ঢেউ এসে লাগছিল নৌকার গায়ে। ঝপাং ঝপাং শব্দ উঠছিল হাতার। কিন্তু তাই বা কতক্ষণ পারে, অন্ধকারে ঠিক ঠাহর হচ্ছিলনা গতিটা। ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল পরাণ, ঠিক এমনি সময়েই একটা ঘুর্ণির আবর্তে পড়ে আর টাল সামলাতে পারেনি নৌকাটি। পরাণ আর্তনাদ করে বলে উঠেছিল, পারলাম না গো, হেরে গেলাম। ব্যাস—ওই পর্যন্ত, আর পরাণের গলা শোনা যায়নি। সে স্বর স্তব্ধ হয়ে আছে এইখানে। এই ঘাটে।

এরপর বহু কাল কেটে গেছে। আজো পরাণ বেঁচে আছে—নদীর এই ঘাটে।

সে নৌকার সব যাত্রীই মরেনি। যারা বেঁচেছিল, তারা বলেছিল—পরাণ মরত না, একটি শিশুকে বাঁচাতে গিয়েই মরে গেছে পরাণ।

আজ অনেক কাল পর কেন এই কথা মনে হলো, তার কারণ বলতে পারবে না নবীন। কেনই বা পরাণের জন্য বেদনা বোধ করলো, তারও কারণ তার কাছে স্পষ্ট নয়।

—কিষ্ট ঠাকুর নাকি ?

চমকে উঠলো নবীন। অনেক দিন এ ডাক শোনেনি। এ নামে ডাকত একটি মানুষই, কিন্তু তার কি আসা সম্ভব! নবীন মুখ ফিরিয়ে দেখল, নন্দদুলাল।

প্রিয়জনকে না দেখতে পেলে দুঃখ হয়। সে দুঃখ কিছুটা দূরীভূত হয় প্রিয়জনের আপনার জনকে দেখলে। নবীনের মন উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। —নন্দদুলাল যে. এই সময়ে গাঁইতি কাঁধে নিয়ে কুথায় যাইছিস্, জিজ্ঞেস করলো নবীন।

নন্দ দুলাল বললো, কাজে, কিন্তু তুমি আজকাল যাওয়া ছাড়্যা দিলে নাকি ?

তা ছেড়ে দিয়েছে বৈকী। সেই যে বেরিয়ে এসেছে তারপর থেকে আর যায়নি। গাঁয়ের কয়েকজন নিত্য আসে আখড়ায়।

—সময় করে উঠতে পারি নাই ভাই। তা তুমি কি জুতার ব্যবসা ছেড়ে দিলে ?

—হ, উয়াতে পেট ভরে না। শুনলুম তুমি খুব ঘটা করে আখড়া খুললে।

—তোমরা ত কেউ আসো নি।

—আসবার ইচ্ছা ছিল কিষ্ট ঠাকুর, কিন্তু আসতে পারি নাই।

—কেন ?

—শাশুড়ীর বারণ। ভৈরবীকে সারা রাত শিকল দিয়ে রেখে দিয়েছিল। আসতে দেয়নি।

একী অন্যায় কথা! অবাক হয়ে গেল নবীন নন্দ দুলালের কথা শুনে।

—তুমি কিছু বলেছো ? জিজ্ঞেস করলো নবীন।

—কইবার উপায় কি ? আমি যে ঘর-জামাই। তবে হ্যাঁ, ইবারে কইব। ভৈরবীকে নিয়ে ইবারে ঘর বাঁধিব কিষ্ট ঠাকুর। আমি চলি।

নবীন মনে মনে বললো, তাই করো দুলাল, তাই করো। ওকে নিয়ে যাও এখান থেকে—দূরে বহু দূরে।

সত্যই কি অন্তরের এই বাসনা তোর নবীন ? মনের মানুষটি ক্ষণে

ক্ষণে রসিকতা করে নবীনের সঙ্গে। সে-ই প্রশ্ন করলো নবীনকে। নবীন উত্তর দিল, এ ছাড়া ওকে ভুলা যায় কই ?

—চলে গেলেই কি ভুলতে পারবি ? সে ত তোর চোখের বাইরে নেইরে, সে যে চোখের তারায় আশ্রয় নিয়েছে। তুই যেখানে যাবি ওই ভৈরবীও সেইখানে যাবে।

কিন্তু সংসারের মধ্যে জড়াঞ পড়লে আমার চলবেক ক্যানে ? মনের মানুষটি হাসলো।

—হাসলে যে ?

—তোর কথা শুনে। সংসারের বাইরে থেকে সংসারের সেবা করবি নবীন ? বাইরে থেকে রূপটাই দেখবি, অন্তর দেখতে হলে সংসারের প্রতি বৈরাগ্য এলে ত চলবে নারে।

অনেকক্ষণ নদীর ঘাটে বসে থাকল নবীন। দহের জলে ওর প্রতিবিম্ব পড়েছে, সে তাকাচ্ছে নবীনের দিকে, নবীনের সঙ্গে হলো তার দৃষ্টি বিনিময়—প্রতিবিম্বিত। নবীনের এখনো যৌবন আছে—এখনো মনে তার নানা রক্তের খেলা চলছে। কোত্থেকে দুটো সামকাহাল এসে বসলো একটু দূরে একটা পাথরের উপর। ওদের ডানার ঝাপটায় চমকে উঠলো নবীন। ওদের দিকে তাকাতেই নজরে পড়লো নদীর বালুরাশি। আকাশের সূর্য অনেক উপরে উঠে এসেছে চিক্ চিক্ করছে বালুরাশি, আরো একটু পরেই উত্তপ্ত হয়ে উঠবে ওরা। নবীন উঠলো। অগোছালো পড়ে আছে আখড়াটা। আজ থেকে আপনার হাতেই তাকে সব করতে হবে, আখড়ায় ফিরে এলো নবীন।

—কি বাবা বাউল ঠাকুর এতক্ষণ নদীর ঘাটে কি করছিলে ?

নবীন এসে দেখলো অর্জ্জুন আর কয়েকটি লোক বসে আছে আখড়ার চালায়। নবীনকে দেখে জিজ্ঞেস করলো অর্জ্জুন।

নবীন জিজ্ঞেস করলো, কখন আইলে ?

—এসেছি অনেকক্ষণ। চালার এক পাশে একটা জায়গায় কিছু আনাজ। আর একটা পাত্রে কিছু চাল।

—উসব কি আন্যাছ অর্জ্জুন ভাই। জিজ্ঞেস করলো নবীন।

—খাবে কি, —তাই ইয়াদের বললুম, দে, বাউলকে দে কিছু।

—আমি ত একা মানুষ, আমার জন্য আবার আনা কেন!

—উ সব বড়ো বড়ো কথা রাখ।

অর্জ্জুনের কথার উপরে আর কথা চলেনা। তুলে রাখতে হলো ও গুলি। তারপর এসে বসলো নবীন অর্জ্জুনদের কাছে। ওদের মধ্যে একজন বললো, গায়েন হবেক নাকি বাউল? নবীনের গাইতে আপত্তি নাই। সে বললো, তুমরা যখন কইছ তখন হবেক বৈকী।

—তা হলে হোক্ জলদি জলদি, বললো অর্জ্জুন।

—ক্যানে তুমার তাড়া কিসের? জিজ্ঞেস করলো অর্জ্জুন।

—আমরা সংসারী হে—লাও আরম্ভ কর।

আরম্ভ করলো নবীন—

ক্ষ্যাপা মন
একী করলি পাগলামি
ঘর বাঁধিলি
পর এলো কই
ও তোর ঘরের চেয়ে পর দামী।

গানের সুর, গানের কথা—বড়ো করুণ, মনে হলো অর্জ্জুনের। মনে হলো নবীন যেন কাঁদছে।

অর্জ্জুন বললো, আজ তুমার মন ভালো নাই বাউল।

—কিসে বুঝলে!

গায়েনই বলে দিলেক।

—ঠিক ধরেছ অর্জ্জুন, কে যেন বলছে যে পরকে পাবার আশায় আখড়া বাঁধলি বাউল, সে কই?

অর্জ্জুন বললো, ই তুমার ভাবের কথা। ওই গায়েনও ভাবের গান। উ সব ভাব আমরা বুঝি না বাউল, সরল করে গাও।

একজন উঠে পড়লো।

—তুমি যে উঠলে? জিজ্ঞেস করলো নবীন।

লোকটি বললো, কাজ আছে।

—কুথায় যাবি? জিজ্ঞেস করলো অর্জ্জুন।

—যাব একবার বিষ্টু মড়লের কাছে। আজ একট হেস্ত নেস্ত করে

লি গা। ইবারে চাষের সময় আইলো। নবীন জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে তাকালো অর্জ্জুনের দিকে। অর্জ্জুন জানে ওই লোকটির সঙ্গে বিষ্টুর সম্পর্কের কথা।

বিষ্টুর জমিতেই ভাগচাষী হিসাবে আজ কয়েক বছর ধরে বিঘা চার জমি কুতে চাষ করছিল মথন তিলি। প্রতি বছর ৮মণ করে চাল কুচুড়ি ছুমি বেঁধে পৌঁছে দিয়ে এসেছে মথন। এবারে নাকি আইন হয়েছে, ভাগে যদি কেউ জমি চাষ করে, তবে জমিটা নাকি তার হয়ে যাবে, তাই ওই জমিটা মথনের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে অন্য এক জনকে দেবার মতলব করেছে বিষ্টু। এখন জমিটা হাত ছাড়া হয়ে গেলে বেচারা মথন খায় কি। তাই মথন বলেছিল, অমন করবেন নাই বাবু।

বিষ্টু উত্তরে বলেছিল, এক সর্তে তোকে জমি দিতে পারি মথনা, যদি যদি তুই লিখে দিস যে আমার জমিতে তুই মাইনা নিয়ে খাটিস! হাল বলদ আমার।

অর্জ্জুনের বর্ণনা দেওয়া হয়ে গেলে মথন বললো, তাই কি কেউ পারে হে, তুমরাই বল ত।

তিন

সেদিন বাস্তুভিটেটা সাধারণের প্রয়োজনে পাঠশালা করবার জন্য রেজিষ্ট্রি করে দিয়ে এলো নবীন। হাতের কাছেই মাল-মশলা আছে, কাজ আরম্ভ হয়ে যাবে ছু দিনের মধ্যেই। বি, ডি, ও সাহেব রেজিষ্ট্রি অফিসের অনেকের সামনেই নবীনের কাজের সুখ্যাতি করেছিলেন। বলেছিলেন, তুমি সত্যই গুণী লোক বাউল। আজ গ্রামের মহৎ উপকার করলে। নবীনের মন আনন্দে ভরে উঠেছিল। ভালোই হলো, ও ত এমনি পড়েছিল—দশ জনের যদি কাজে লাগে, লাগুক। নাম থাকবে বাপের!

রেজিষ্ট্রি অফিসের বাবুদের কথাগুলিই বলছিল নবীন অর্জ্জুনের স্ত্রীকে। রেজিষ্ট্রি অফিসটা—মাইল দশ দূরে। বাসে গিয়েছিল। ফিরে

এসে নেমেছিল অর্জ্জুনের বাড়ীতে। অর্জ্জুন তখনো আসেনি! প্রথম জল পড়েছে বর্ষার। অর্জ্জুন গিয়েছিল ক্ষেতে। শুধু, চাকরির টাকায় পেট ভরে না, তাই চাষও খানিকটা করতে হয় তাকে। আপনার জমি কিছুটা করেছে অর্জ্জুন।

—কাজটা ত ভালোই হৈল দেওর, কিন্তুক আবার যদি তুমি কুনু দিন বিয়া কর, তখন সংসারের মাথা রাখবার মতন টুকচা জমিও ত চাই।

নবীন হেসে উঠলো অর্জ্জুনের স্ত্রীর কথা শুনে।

অর্জ্জুনের স্ত্রী বললো, হাসছ যে!

হাসতে হাসতেই নবীন বললো, তখন অর্জ্জুন ভাই এর ঘর আছে। এইঠ্যানে আন্যাই রাখ্যা দিব তুমার জাকে! এখন ভবিষ্যতের কথা থাক, কিছু আছে ঘরে—ক্ষিদা পাঁয়্যাছে।

—ওমা সে কথা বলতে হয়। তুমি ত আর পর নও দেওর—যা আছে ঘরে, তুমাকে তাই দিতে পারি। দাঁড়াও আনছি।

অর্জ্জুনের স্ত্রী ভিতর থেকে একটা জামবাটিতে কিছু মুড়ি আর একটা ঘটিতে এক ঘটি জল বাড়িয়ে খেতে দিল নবীনকে। নবীন মুড়ি দেখে বললো, অর্জ্জুন ভাইএর ভাগ-ট দিয়ে দিলে নাকি?

অনুমানটা মিথ্যা নয়। অর্জ্জুন ক্ষেতে গেছে। সেই বিকালে ফিরবে ও, কাজেই জলখাবারটা ক্ষেতেই পৌঁছে দিতে হয়। অর্জ্জুনের জন্যই মুড়ি কিনে এনেছিল অর্জ্জুনের স্ত্রী। তা থেকেই খেতে বাড়িয়ে দিয়েছে নবীনকে। কিন্তু সে কথা প্রকাশ ক'রে বল্লে পাছে নবীন না খায় তারই জন্য বললো, উয়ার আলাদা আছে। নবীন খেতে বসলো, নবীনের বৌ বসলো তার সামনে।

—যাই বল দেওর অত বড়ো যে তুমার আখড়া, উ আখড়া শুধু মরদ লোকে মানায় না। আর একা একা তুমি থাকোই বা কেমন কৈরে?

—একা আর কুথায় থাকি? সারা দিনইত ঘুরে বেড়াই, সন্ধ্যা হলেই কতো লোকে যায়—এক দিন যাবে ক্যাম্পে দেখে আসবে।

—আঃ বড়ো যে অবসর আমার! এই সংসারের হুজ্জৎ সামলাবো, না তুমার গায়েন শুনতে যাবো। বলে, অত বড়ো পরব হৈল তুমার, তুমার উঠ্যানে তাই যাত্যা লারেছি!

নবীনের খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। খাবার পাত্রটা নিজেই ধুয়ে দিয়ে রেখে বসলো নবীন।

—গাঁয়ের ত সবাই গেইছিল, যাও নাই তুমি আর ধম্মদাস খুড়ার ঘরের লোকরা।

ধর্মদাসের প্রসঙ্গ আসতেই নবীনের মনে পড়ে গেল ভৈরবীকে। এই পাড়ায় অনেক দিন পরে এসেছে। একবার ওদের বাড়ীর দিকে গিয়ে রেজিষ্ট্রি করার খবরটা দিতে গিয়ে ভৈরবীকে দেখে এলে কেমন হয়। তাই যাবে কিনা ভাবছে, এমনি সময়ে অর্জ্জুনের স্ত্রী বললো, সে সব শুনেছি দেওর। ওই ভৈরবীর মা কি কম লোক, তুমাকে ঘর থাক্যা তাড়ালেক, শেষে জামাইটাকেও দূর করলেক।

এ আবার কী কথা! নন্দ তুলালকে ঘরে রাখবার জন্যই বিয়ে দিয়েছিল ভৈরবীর সঙ্গে। নন্দ তুলাল খারাপ লোক নয়, কোনো সাংঘাতিক অপরাধ সে করতে পারে তা দেখে মনে হয় না তার। স্বাভাবিক ভাবেই ঘটনাটা জানতে ইচ্ছা হলো তার, সে জিজ্ঞেস করলো, ক্যানে?

যতটুকু জানত অর্জ্জুনের স্ত্রী, ততটুকুই বললো। কোথায় নাকি কারখানায় চাকরি করছিল নন্দ তুলাল। হাঁ, করছিল—নদীর ওপারে নূতন নাকি একটা কারখানা হচ্ছে।

খাটালির পয়সা যা পেত তাই নাকি পাই পয়সার হিসাব চেয়েছিল ভৈরবীর মা। জামাই বলেছিল, আমার বাড়তি পয়সা নাই।

শাশুড়ী বলেছিল, তুমাকে খাই খরচ দিতে হবেক। তাই দিচ্ছিল নন্দ তুলাল। কিন্তু তাতেও সন্তুষ্ট ছিল না ভৈরবীর মা, সে আরো কিছু বেশী চায়। তাই নগদ টাকা না চেয়ে জিনিষ চাইতে শুরু করেছিল শাশুড়ী। একদিন বলেছিল, তু কুড়ি টাকায় একটা ভালো গাই আছে—সেইটা কিনে না আনলে তুধের রোজ বন্ধ হঁয়্যা যাবেক।

জামাই সত্যই কিছু পয়সা জমিয়েছিল। কিন্তু এই জমানো পয়সা সে এমনি ভাবে খরচ করতে চায় না, তাই বলেছিল, উ পয়সা আমি খরচ কৈরব নাই।

—কি করবে তবে

—আমি ঘর করব

হ্যাঁ, এ কথাও যেন একদিন বলেছিল নন্দ দুলাল—কিষ্ট ঠাকুর, আমি ঘর কৈরব, আর সেই ঘরে লিয়ে যাব ভৈরবীকে। তা অন্যায় ত কিছু বলেনি নন্দ দুলাল! শাশুড়ী রেগে বললো, বেশ তবে তাই করগা, যাবেক নাই ভৈরবী, আমি উয়াকে পাঠাব নাই।

—সেই জামাই চলে গেইছে।

আর ভৈরবী ?

প্রশ্ন জাগলো, কিন্তু জিজ্ঞেস করতে সাহসী হলো না নবীন। শুধু এক দিকে তাকিয়ে থাকলো নবীন। ভবিষ্যতের একটা ছবি যেন তার চোখের সামনে ধরা দিয়েছে—সে ছবি খানিকটা মনোরম, খানিকটা বেদনাময়। না, এ সময় তবে আর ধর্মদাসের বাড়ীতে যাওয়া ঠিক নয়। কিছু মনে করতে পারে ধর্মদাসের স্ত্রী। কাজ নেই সেখানে গিয়ে, তার চেয়ে আখড়াতেই ফিরে যাওয়া ভালো। আখড়ায় ফিরে যাবে কি না ভাবছে এমনি সময় বাইরে একটা গোলমাল শোনা গেল,—গোলমালের মধ্যে গলা চেনা মুস্কিল—মনে হয় বেশ কয়েকজন আছে সেখানে। নবীন বললো, আজ উঠি।

অর্জ্জুনের ঘর হতে বের হয়ে বাইরে এসে আবার ভাবলো, এ সময় আখড়ায় ফিরে গিয়েই আর করবে কি, তার চেয়ে মাঠে অর্জ্জুনের কাছেই গিয়ে সময়টা কাটিয়ে দিয়ে আসবে। মাঠের দিকে রাস্তা ধরে এগিয়ে যেতেই নজরে পড়লো মথনকে—তার হাল-বলদ সমেত টেনে নিয়ে আসছে বিষ্টু মড়ল। মথনও শক্ত পা ফেলে এগিয়ে আসছে তার সাথে। দাঁড়ালো নবীন। কাছে এলো ওরা।

বিষ্টু বলছে, চল, থানায় নিয়ে যাবো তোকে। পরের জমিতে হাল নামানোর সখ একবার মিটুক।

মথন উত্তর দিচ্ছে, ওই জমির সঙ্গে তুমার ক দিনের সম্বন্ধ মড়ল, জমিতে সার দিয়েছি আমি, গোবর দিয়েছি আমি, আজ তুমাকে লিখে দিই নাই যে আমি তুমার জন খাটব বলে, তাই জমি তুমার হুঁয়্যা গেল ? চল থানায় আমিও দেখাব কুতের কাগজ।

—আমি তোকে কোনো কাগজ দিইনি, ও সব চালাকি।

—বছর বছর যে আট মণ কৈরে চাল নিয়েছে, সে কথা মনে নাই। আজ আইন আস্যাছে আর অমনি সব ভুলে গেলে? উ জমি আমিও কাকেউ চষতে দিব নাই, এই আমার কথা!

—সেই কথাই বলিস দারোগা সাহেবের কাছে।

—বলব বইকি।

এর উত্তরে কি বললো বিষ্টু ঠিক বোঝা গেল না। ওরা চলে গেল, সোজা পূর্ব দিকে—থানার পানে। নবীন একটু দাঁড়িয়ে থাকল রাস্তার ধারে তারপর সোজা পশ্চিম দিকে চলে গেল অর্জ্জুনের সন্ধানে। অর্জ্জুনকে সব কথা জানানো প্রয়োজন, যদি একটা কিছু উপায় করতে পারে, করবে। বার বার একটি কথাই মনে পড়ছিল নবীনের। বড় দুঃখে বলেছে কথাটা 'জমিতে সার দিয়েছি আমি, গোবর দিয়েছি আমি আর আমি লিখে দিই জন খাটবো সেই জমিতে?'

. ঠিক বলেছে মথন। যে জমি করলো—জমিতে তার স্বত্ব নাই, যে জন্ম দিল সে মালিক নয়? বাঃ বেশ কথা কিন্তু। মনের মধ্যে একটা সুর খেলে গেল নবীনের। ওর অন্তরের কবি মানুষটি সুর করে গেয়ে উঠল,—

হায়রে যার জমির সাথে নাই সম্বন্ধ
সেই জমির মালিক হয়।
ওসে এই মালিকানার স্বত্ব দিয়ে
খাজনা গুণে লয়।
ওরে সে করল পরিপাটি
যে দিল ভাই গোবর মাটি
যে জন্ম দিল সোনার ক্ষেতে
'সে জন্মদাতা নয়?

কখন গুণ গুণ করতে করতে সুর চড়ে গেল নবীনের,—তা নিজেই বুঝতে পারেনি, চমক ভাঙলো তার রাস্তার ধারে বড়ো পুকুরটার পাড়ে ভৈরবীকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে। স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিল ভৈরবী। ঠিক যেমন বেদের বাঁশী শুনে বিষধরী দাঁড়িয়ে থাকে স্থির ভাবে, কোনো দিকে তার নজর থাকে না, কোনো চেতনা থাকে না।

ভৈরবীকে দেখে গান বন্ধ করলো নবীন। হৃদয়টা আনন্দে দুলে উঠলো, স্থান কাল ভুলে সে এগিয়ে গেল পুকুরের পাড়ের দিকে। ভৈরবী তখনো দাঁড়িয়ে। সে যেন ওকে আকর্ষণ করবার জন্যই দাঁড়িয়ে আছে শুধু। খালি গায়ের উপর ভিজে কাপড়ের আবরণটা দেহের সৌন্দর্যকে ঢেকে রাখতে গিয়ে আরো সৌন্দর্যময়ী করে তুলেছে ভৈরবীকে। ডান দিকের বাহু ও বুকের অনেকখানা অংশ অনাবৃত,—

—ভৈরবী!

কাছাকাছি গিয়ে ডাকতেই, ভৈরবী পালিয়ে গেল পুকুরের অপর পাড়ের নীচে। অদৃশ্য হয়ে গেল ভৈরবী। নবীন খানিক অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল সেইখানে,—সম্ভব অসম্ভব অনেক কটা কারণ আবিষ্কার করবার চেষ্টা করলো,—কিন্তু কোনো যুক্তিই যখন সন্তুষ্ট করতে পারলো না নবীনকে। মনটা ভারী হয়ে উঠলো তার। ছিঃ এদিকে না আসা ছিল ভালো। মিছি মিছি এদিক পানে এসে একটা ব্যথার ফুল কুড়িয়ে নিয়ে যেতে হবে তারে। কাজ নেই আর অর্জ্জুনের কাছে গিয়ে, ধরা পড়ে যাবে নবীন।

ফিরে এলো আপনার আখড়ায়।

দুটো দিন আর বাইরে গেল না নবীন। এই দুটো দিন অর্জ্জুনও আসেনি তার কাছে। তৃতীয় দিনের দিন আর ঘরের মধ্যে আবদ্ধ না থাকতে পেরে বেরিয়ে পড়লো নবীন। হাতে নিল একতারা, কোমরে বাঁধলো ডুগীটি, কাঁধে ঝুলিয়ে নিলো ভিক্ষার ঝুলি। পায়ে চলা মেঠো পথের উপর এসে দাঁড়ালো নবীন—সে পথ তাকে নিয়ে গেল নদীর ঘাটে। নদীতে নামবার আগে দহের নির্মল জল খানিকটা নিয়ে মাথায় ঠেকালো নবীন, তারপর ওপারে গিয়ে উঠলো। বাঁ হাতে ষ্টেশন যাবার রাস্তা, এখান থেকেই ডিসট্যান্ট্ সিগন্যালটা দেখা যায়। এই রাস্তা দিয়েই রাধারা গিয়েছে, প্রতিদিন এই রাস্তা দিয়েই অর্জ্জুন কাজে যায়,—এখন অর্জ্জুন হয়ত ইষ্টিশনেই আছে। হরিদাদা আছে। গেলে খাতির করে হরিদাদা। দোকানের বেঞ্চিটাতে বসিয়ে চা খাওয়ায়, বিড়ি দেয়—কখনো কখনো নগদ পয়সাও দেয় দু' চার আনা। না, থাক ইষ্টিশানেও যাবে না ও। আজ ভিক্ষা করতে

বেরিয়েছে নবীন—বাড়ী বাড়ী গিয়ে গান শোনাবে, ভিক্ষা চাইবে, মুষ্টি ভর চাল। বিপরীত দিকের রাস্তাটা ধরে বেশ খানিকটা এগিয়ে গেল নবীন—জঙ্গলের দিকে। পাহাড়ে জমি, শাল পলাশ আর বাঁশ ঝাড়ের জঙ্গল। কোনো রাস্তা নেই, নবীনের মত যাত্রীদের পায়ে পায়ে সরু ফিতের মত একটি রাস্তা পলাশ গাছের তল দিয়ে এঁকে বেঁকে চলে গেছে জঙ্গল যেখানে গভীর সেই দিকে। কিছু দূর সেই পথ দিয়ে এগিয়ে গিয়ে দেখলো নবীন, জঙ্গলের অনেকটা ফাঁকা। পাতলা হয়ে গেছে জঙ্গলটা। যেখানে বাঘ লুকিয়ে থাকত—সেখানে পড়ে আছে কয়েকটা ছোট ছোট ঝোপ ঝাড়—হয়ত ইচ্ছা করেই রেখে দিয়ে গেছে এই ঝোপগুলিকে। অনায়াসে যে কোন মানুষ নির্ভয়ে এগিয়ে যেতে পারে। অথচ এই জঙ্গলের পাশ দিয়ে যেতেও এক দিন মানুষের বুক কেঁপে উঠত। ছিল জন্তু জানোয়ারের ভয়, ছিল দুষ্ট মানুষের ভয়। এর পাশ দিয়ে চলে গেছে বাদশাহী সড়ক—সে রাস্তা দিয়েও যাওয়ার উপায় ছিল না। দল বেঁধে আক্রমণ করত মানুষগুলিকে। পরণের কাপড়টা পর্যন্ত খুলে নিত। বাধা দিতে গেলে জীবন হারাতে হতো। এখনো পাহাড় খুঁড়লে—মাটির তলে পাওয়া যাবে কত নরকংকাল।

—ভোঁ-ও-ও—

একটা কিসের শব্দ কানে এলো নবীনের। ডান পাশে চোখ মেলে তাকাতেই নজরে পড়লো, কয়েকটা বড়ো বড়ো চিমনি। জঙ্গল নেই—কয়েক সারি পাকা-বাড়ী। বসতি হয়েছে—, হর্ষোৎফুল্ল হয়ে উঠলো নবীন। বাঃ বেশ সুন্দর দেখতে—, পা চালিয়ে এগিয়ে গেলো সে—, আরো কাছে গেলো চিমনী গুলোর, অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলো শুধু। চোখে ওর বিস্ময়-বিমুগ্ধ দৃষ্টি। কয়েক হাজার একর জমির উপর চলছে সৃষ্টির কারবার। জঙ্গল কেটে পথ হচ্ছে, পাহাড় কেটে হচ্ছে সমতল ময়দান—ময়দানের উপর ময়দানবের খেলা! বাজার বসেছে--চলছে লেনদেন, ছুটে যাচ্ছে মানুষের সারি ওই চিমনীগুলোর দিকে। এ দৃশ্য দেখেনি নবীন।

একটা গাছের ছায়ায় বসলো নবীন। অনেকটা চলে এসে খানিকটা ক্লান্ত হয়েছে সে। একটু বিশ্রাম প্রয়োজন।

ওকে দেখে কয়েকজন মেয়ে পুরুষ এলো ওর কাছে। নবীন জিজ্ঞেস করলো, এখানে কি হৈছে ভাই।

— কারখানা। একট গায়েন কর ক্যান্নে।

—-কৈরব।

—কে করছে ?

—আমরা, আবার কে।

নবীনের মনে নূতন প্রশ্ন, অদ্ভুত জিজ্ঞাসা। তাহলে সৃষ্টিকর্তা কে ?

—আর ওই চিমনী ?

—সেও আমরা।

—তাহলে ত তোমরাই ভগবান হে।

নবীনের কথা শুনে হেসে উঠলো মানুষগুলি। পাগলা বাউল, নইলে এমন কথা কইতে পারে ? নবীনের মনের বীণায় নূতন সুর ধ্বনিত হয়ে উঠলো, নূতন ভাব নূতন কথা! এ কথা এ ভাব এ সুর, এর পূর্বে কোনো দিন বৈজ্ঞানিকের এক তারায় ধরা দেয়নি। এক তারার তারে আঙ্গুল পড়লো নবীনের। নবীন গুণ গুণ করে সুর ভাঁজলো। বসে থাকা মানুষগুলি বললো, এক-ট গায়েন।

—শুনবে ? শুন—

ওরে, তোরাই ভগবান
তোরা ভাঙিস, তোরা গড়িস
তোরা শক্তিমান
ওরে তোরাই ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ
তোরাই ভগবান।

অবাত হয়ে গান শুনলো ওরা। নির্বাক মানুষগুলি, চোখের দৃষ্টিতে বিস্ময়! এমন গান ইতিপূর্বে শোনেনি ওরা।

আপনার কানেই কেমন যেন নূতন শোনালো কথাগুলি। আবার গাইলো নবীন। কণ্ঠে ওর বাগদেবী আশ্রয় নিয়েছে। মনের পাত্র থেকে উপচে উঠছে তার ভাব—, একটা প্রচণ্ড অস্থিরতা অনুভব করলো নবীন। একটা বেদনা—ঠিক, সন্তান প্রসবের পূর্বাহ্নে যে যাতনা অনুভব করেন জননী—এও যেন সেই রকম।

ওরে এই ধরণীর সৃষ্টি শালায়
তোদের সৃষ্টি চলে নানা ধারায়
ওরে তোদের পরশ পেয়ে
অহল্যা পায় প্রাণ ॥

ইতি মধ্যে আরো কিছু মানুষ এসে ওকে ঘিরে শুনছিল ওর গান। রাস্তার কাজ হয়ে গিয়েছিল বন্ধ। রাস্তার মালবাহী ট্রাকের ড্রাইভার গাড়ী থামিয়ে শুনছিল নবীনের গান। গান ভাঙলে, ভীড় থেকে একটি মানুষ বেরিয়ে এসে বললো, এবার ফিরে যাবেক নাই কিষ্ট ঠাকুর? সেই সম্বোধন! —এক জনই শুধু ওই নামে ডাকে নবীনকে। এখানে তাকে সেই নামে ডাকলো কে! নবীন চোখ মেলে তাকাতেই দেখলো—সামনে নন্দত্বলাল।

নন্দ দুলাল চলে এসেছে ধর্মদাসের আশ্রয় ছেড়ে।

—দুলাল!

অনেক দুর্বল হয়ে গেছে নন্দ দুলাল। সারা গায়ে মাটি মাখা। লাল মাটি ওর পরিধেয় বস্ত্রটার রঙও পাল্টে দিয়েছে।

—এখন তুমি কুথায় থাকো দুলাল?

—আমার কি আর ঘর দুয়ার নাই নাকি কিষ্ট ঠাকুর! সবই আছে।

—কিন্তু ভৈরবী?

—সে সুখ আর কপালে জুটলো কই বাউল? চল, যাই।

নবীন যখন ফিরে এলো আখড়ায়, তখন রাত্রি হয়ে গেছে। আখড়ায় প্রদীপ জ্বলেনি। প্রান্তরের মাঝে অন্ধকারে মিশে আছে নবীনের আখড়া। আখড়ায় পা দিতেই অন্ধকারের মধ্যে একটা কালো মানুষকে বসে থাকতে দেখে চমকে উঠলো নবীন।

—কে হে উঠ্যানে?

—আবার কে? তুমার তরে যার মাথা ব্যথা বেশী সে ছাড়া আর কে থাকবেক?

গলাটা ঠিক অর্জ্জুনের মত।

—অর্জ্জুন নাকি?

—হুঁ, কিন্তু ব্যাপার কি বাউল। আখড়া কৈরেছিলুম—কুথায়

সাঁঝের বেলায় গান বাজনা হবেক, তা-লয় একেবারে তুমার পাত্তা নাই ?

নবীন এই প্রশ্নের কোনো জবাব না দিয়ে বললো, দাঁড়াও আলোটা জ্বালে আনি। আলো জ্বাললো নবীন! হাত পা ধুয়ে এসে বসলো। সেই যে মালিনীদের গাড়ীতে চড়িয়ে দিয়ে এসেছে, তারপর আর সেদিকে যায়নি নবীন। ইষ্টিশনের খবর অনেক দিন পায়নি, তাই আজ অর্জ্জুনকে দেখে, জিজ্ঞেস করলো, ইষ্টিশনের খবর কি অর্জ্জুন ?

—সোব ঠিক হ্যায়। মাষ্টাররা এক দিন গাইতে বলছিল হে বাউল ঠাকুর।

—বেশ ত—

—বেশ ত কি, আমি বলেছি হবেক নাই। ফেল কড়ি মাখ তেল, তুমি কি আমার পর ? পয়সা দেয় হবেক, না দিলে—উহুঁ বাবা সি হবেক নাই। লাও বিড়ি খাও। অর্জ্জুন একটা বিড়ি এগিয়ে দিল নবীনকে।

—হরি দাদা কি বলে ? জিজ্ঞেস করলো নবীন্।

—সেই ত বল্লেক, বল্লেক, বলে দিস অর্জ্জুন, টাকা না দিলে গায়েন যেমন না করে। আর এক কথা বাউল ঠাকুর, ইবারে মাইরি, তুমাকে মেলাতে গাইতে হবেক।

এই সময় একটা মেলা বসে মাইল পাঁচ দূরে, বলে মোহনপুরের মেলা। কখনো বৈশাখের শেষে কখনো আবার জ্যৈষ্ঠের পূর্ণিমায় মেলাটির পত্তন হয়। একটি রাতের কারবার। ক্ষণস্থায়ী পরমায়ু বলেই হয়ত জমজমাট এর আসর। বাইরের থেকে দোকান আসে—জুতোর দোকান, খাবারের দোকান—বাসনপত্রের দোকান। কারবারী লোকেরা একটা রাতে কারবার করবার জন্য দু-তিন দিন আগে এসে ঘর বানায়। মনোহারী জিনিস আনে। গান বাজনার আসরও বসে। বাউল বৈষ্ণব যায়। খেমটা, লাচনী লাচ চলে—এক পাশে থাকেন এক পাথরের মূর্তি—ঠিক কিসের মূর্তি বোঝা যায় না। লোকে বলে মহাবীরের, আর অন্য পাশে থাকে একটা মদের দোকান, জুয়া চলে সারা রাত। এইটিই মেলার বিশেষ আকর্ষণ। কিছু কিছু দেহ ব্যবসায়ীরাও মেলায় গিয়ে কিছু রোজগার করে আনে। বহু দিন আগে একবার গিয়েছিল নবীন।

তখন ছোট ছিল সে, তবু এখনো মনে আছে। গান্ধী মহারাজ বলেছিলেন মদের দোকানে মদ যেন কেউ না খায়, তাই দেখতে। সেই বছর। মানভূম থেকে এসেছিলেন এক বড়ো নেতা—মদের দোকানের সামনে বসিয়ে দিয়েছেন নিজের লোক। গান্ধী টুপী পরে বসেছিল তারা ঠিক দরজাটাতেই। দেখে ভক্তি হয়েছিল নবীনের। ওদের পাশে নিজেও বসেছিল সারা রাত। সেই শেষ যাওয়া—আর যায়নি। আজ আবার সেই মেলাতে যাবার জন্য আমন্ত্রণ এসেছে নবীনের।

অর্জ্জুন বললো, ইবারে কায়েৎরা রাধা বাউলকে আনাবেক। আমরাও লিয়ে যাবো তুমাকে। দেখি কে জিতে। পাল্লা দিয়ে তুমাকে গাইতে হবেক মড়ল।

নবীন অর্জ্জুনের কথা শুনে হাসলো।

—হাসলে যে ? অর্জ্জুনের ধারণা হয়েছিল, নবীন যেন গুরুত্ব দিচ্ছে না তার কথায় !

—পাল্লা দিয়ে কি গাইতে পারব অর্জ্জুন ?

—পারতেই হবেক। বাজী রাখেছি। কায়েৎদের হারাতেই হবেক। এই লাও বায়না। ছুটো টাকার একটা নোট নবীনের হাতে গুঁজে দিল অর্জ্জুন।

নবীন টাকা ছুটি অর্জ্জুনের হাতে তুলে দিতে গিয়ে বললো, টাকা নিয়ে আমি কী কৈরব ?

—তুমার মান্য। চলে যেতে গিয়ে ফিরে এসে বললো, এক কাজ কর বাউল, তুমার সেই রাধাকে লিয়ে আসি, আচ্ছা গলা উয়ার।

প্রস্তাবটা মন্দ নয়, কিন্তু গোঁসাইজী রাজী না হলে ওকে আনার উপায় নেই। একবার বলে দেখবে গোঁসাইজীকে।

এও এক পরীক্ষা! এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার সঙ্গে জড়িয়ে আছে হরিদাদা অর্জ্জুনের সম্মান। সুনামের সঙ্গে উত্তীর্ণ না হতে পারলে অর্জ্জুনকে অপদস্থ হতে হবে হাজার লোকের কাছে। গাইবে সে—নূতন গান গাইবে, যে গান শোনেনি এরা। নূতন সুর দিবে। সুরের মুর্চ্ছনায় আর গানের শব্দঝংকারে শ্রোতৃমণ্ডলী যেন দেখতে পায় আপনাদের। রাত্রি বেলায় কেরোসিনের আলোটা জ্বেলে, তার

সামনে কাগজ পেন্সিল নিয়ে বসলো নবীন। রাত্রি জেগে গান লিখলো নবীন। এক তারার সঙ্গে গলা মিলিয়ে স্বর দিলো। ভালোই লাগলো ওর নিজের কাছে।

নির্দিষ্ট দিনে মেলায় এলো নবীন, এলো নয়, নিয়ে এলো অর্জ্জুন, গাড়ী করে। হরিদাদা মিষ্টি আর তেলে-ভাজার দোকান নিয়ে এলো। সেইখানেই আড্ডা নিলো অর্জ্জুন আর নবীন। মেলাটা ঘুরে এলো একবার নবীন। তেমনিই আছে, যেমন দেখেছিল সেই বাল্যকালে। অর্জ্জুন ওকে আসরটা দেখিয়ে দিলো। একজন জিজ্ঞেস করলো, এই তুমাদের গায়ক নাকি হে! কায়েতদের লোক। তলানী আদায় করছিল মেলায়। ছোট দোকান, আট আনা, বড়ো, এক টাকা।

অর্জ্জুন সমীহ করে উত্তর দিল, আজ্ঞে হুঁ।

—শেষে মুখ নিয়ে যেতে পারবে ত ?

—মুখটা আর রেখে যাব কার কাছে বলুন। মেলায় অনেক 'মনিহারী' দোকান ত আস্যাছে—না হয়, ওই যে কি বলে—সোনো না কি, তাই ঘসে নিয়ে যাবো। উত্তর দিল নবীন।

এর কোনো জবাব দিল না লোকটি।

প্রথম শুরু করলো রাধা। গেয়ে গেলো দেহতত্ত্বের গান, ভাগবৎ-তত্ত্বের গান। সঙ্গের মেয়েরা দোহার গাইলো। নৃত্যের তালে তালে রাধার অঙ্গ উঠলো দুলে। অপূর্ব ভঙ্গিমায় আপনার বক্তব্যকে প্রকাশ করবার চেষ্টা করলো রাধা। দর্শকরা বাহবা দিলো, আনন্দে করতালি দিলো। সবাইকার প্রশংসা কুড়িয়ে আসন নিলো রাধা।

এবার নবীনের পালা। রাত্রির মধ্য পর্যায়ে আসন পেলো নবীন। অর্জ্জুন আসরে উঠে বললো, ইবারে নবীন বাউল আসরে নামবেক। আইস, আইস নবীন। নবীন সবাইকার উদ্দেশে নমস্কার ক'রে আসরে উঠে দাঁড়ালো। মাথায় চূড়া, গলায় ফুলের মালা, হাতে একতারা, কোমরে ডুগী। অর্জ্জুন তাকিয়ে দেখলো নবীনকে। আহা, তাকিয়ে দেখার মত রূপ বটে নবীনের। ঠিক যেন ব্রজের গোপাল।

—মান রাখতে হবেক বাউল, সংগোপনে বললো অর্জ্জুন।

নবীন একবার তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে তাকিয়ে দেখলো উপবিষ্ট মানুষগুলিকে। মেয়েরাও এসে বসেছে, তবে সংখ্যায় খুব কম,—পরিচিতা অনেককেই দেখলো। ওদের গাঁ ভেঙে মেয়ে পুরুষ এসেছে, কিন্তু কই ভৈরবীকে ত দেখতে পাচ্ছে না নবীন। বলতে গেলে, এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করবার সময় এমনি একটি আশা করেছিল নবীন—আশা করেছিল, ভৈরবী থাকবে, তাকে গান শোনাবে নবীন। এবারেও কি—

—আরম্ভ কর নবীন। পিছন থেকে বললো অর্জ্জুন। নবীন জিজ্ঞেস করলো, ধম্মদাস খুড়ারা আসে নাই?

—কে জানে? এই ভীড়ে কে কার খোঁজ রাখে বল। থাকলে নিজেই আসবেক।

. না, থাকলেও আসবে না। ভৈরবীকে বড়ো অবিশ্বাস ওর মায়ের। একলা পাঠাবে না কিছুতেই, সঙ্গে আসবে ওর মা। এলেও এই আসরে কিছুতেই আসতে দিবে না ভৈরবীকে।

—ওই রাধা বাউলের গানের জবাব দিতে হবেক বাউল।

তাই দিবে।

নবীনের একতারার তারটি তুললো স্থর, গাইলো নবীন,

শুন শুন সভাজন
কহি কিছু বিবরণ,
আমি দেহ তত্ত্বের নইগো বাউল
ভগবান নেই আমার গানে
আমি সারা জীবন ধরে পূজেছি
নর-নারায়ণে ॥

গানের নূতন কথাগুলি মর্মে গিয়ে প্রবেশ করলো শ্রোতাদের। অবাক হয়ে তারা তাকিয়ে থাকলো নবীনের দিকে। নবীন গেয়ে চললো,

এর কারণ কিছু সত্যি আছে
কইব সর্ব জনের কাছে
তাই শুনে ভদ্র জনে
ভেবে দেখবেন মনে মনে
কেন সারা জীবন ধরে পূজেছি নর নারায়ণে ॥

বাউল একতারাটি সামনের দিকে তুলে সকলকে সম্বোধন করে বললো, ভদ্রগণ, আপনারা আশ্চর্য হচ্ছেন নিশ্চয়। চিরাচরিত রাস্তায় না গিয়ে আমি একী পথ ধরেছি। একী গান বাউলের কণ্ঠে। কিন্তু ভাই, বাউলের কাছে শ্রেষ্ঠ সম্পদ ত ভগবান নয়, তার দেহ, আত্মা নয়—তার শ্রেষ্ঠ আশ্রয় আর শ্রেষ্ঠ সম্পদ হলো মানুষ। তাই আমি গাই মানুষের গান। মানুষই ত ভগবান, ভগবানও ত এই মানুষকে আশ্রয় করেই বিরাজমান। শ্রোতারা তাকালো পরস্পরের দিকে। এ কেমন কথা! ভগবান থেকে মানুষ বড়ো?

নবীন বলে চললো, অথচ এই মানুষের দুঃখ কত। নবীনের মনের পর্দায় ভেসে উঠলো তার হাল গরু সমেত মথনকে থানায় টেনে নিয়ে যাবার দৃশ্যটি। কোনো ঘটনা যদি গভীর ভাবে মনকে নাড়া দেয়, তখনই তা প্রকাশ হবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠে। চিত্রকর তাকে ধরে রাখে চিত্রে—রঙে, গায়ক রাখে সঙ্গীতে। নবীনও রেখেছে, মনে পড়ে গেলো সেই কথাগুলি। নবীন গাইলো—

যারা ক্ষেতে খেটে ফলায় সোনা
দেখেছি মরতে পথে তাদের সোনায়
দেখেছি মৃতা জননীর বুকে
অবোধ শিশুগণে।
তাই সারাজীবন ধরে—

আত্মহারা হয়ে গেলো নবীন। ভাবাবেগে গড়িয়ে পড়লো জল তার চোখ দিয়ে। ভাবে বিভোর নবীন যখন তার গান শেষ করলো তখন সমস্ত দেহ যেন ভেঙে পড়তে চাইলো তার। শ্রোতারা আনন্দে বিস্ময়ে শ্রদ্ধায় বসে থাকলো চুপ করে। কোলাহল নেই, কলরব নেই। হরি আসরে এসে সকলের সামনে ঘোষণা করলো, আমি বাউলকে একটি রূপার মেডেল দিলুম।

করতালি দিয়ে উঠলো সবাই।

অর্জ্জুন নবীনকে জড়িয়ে ধরে বললো, সাবাস বাউল, সাবাস। উয়াদের মুখ চুপ (চুপ) হঁয়্যা গেইছে।

অর্জ্জুনের কথার সাথে একটা উগ্র গন্ধ নবীনের নাকে গেল।

আপনার অজ্ঞাতেই নবীনের দেহটা সংকুচিত হয়ে উঠলো। নবীন বললো, তুমি মদ খেয়েছ অর্জ্জুন।

—রাগ করোনা মাইরি, তীথখানে আস্যাছি, এ্যাল্ল এই এতটুকু, বুঝেছ—এ-ই এতটুকু খায়্যাছি।

রাগ করেনি নবীন, কিন্তু ও কেমন যেন সহ্য করতে পারে না ওই পদার্থটাকে।

নবীন বললো, না রাগ করিনি।

—উহু কৈরেছ। মাইরি বলছি, আমি একা খাই নাই, সব ব্যাটা বিটিই খায়্যাছে, ওই যে ধম্মদাসের বিটি ভৈরবী, উও দেখগা কি মাতলামি করছে।

চমকে উঠলো নবীন। ওর অন্তরে কে যেন হাতুড়ির ঘা মারলো। ভৈরবী এসেছে তবে, এখানে না এসে মদ্যশালায় গিয়ে আকণ্ঠ মদ খেয়ে মাতলামি করছে।

নবীন বললো, কোথায় দেখলে ?

—দেখবে ? আইস। টেনে নিয়ে গেল নবীনকে।

ভীড় ঠেলে ঠেলে একটা জায়গায় নবীনকে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করিয়ে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল।—ঐ ভাল (দেখ)। একটা পানের দোকানের সামনে একটি ভীড়ের মধ্যে একটি মেয়ে অঙ্গভঙ্গি করে নাচছে। আমোদ উপভোগ করছে সবাই। কেউ শিস্ দিচ্ছে, কেউ অশ্লীল কথায় আপনার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছে মেয়েটির। নবীন এগিয়ে গেলো দুহাতে ভিড় ঠেলে। গিয়ে দাঁড়ালো ভৈরবীর সামনে। আজ সেজেছে ভৈরবী, মাথা বেঁধেছে গন্ধ তেল দিয়ে। গলায় পরেছে রূপোর বিছে হার। কানে দিয়েছে মাকুড়ী, দু হাতে পরেছে লাল রেশমী চুড়ি। মুখখানা তাম্বুল রাগে রঞ্জিত। নবীন কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে ডাকলো, ভৈরবী। কড়া কঠিন স্বর। যেন ধমক দিয়ে উঠলো নবীন। ভৈরবীর নৃত্যের ছন্দ পতন ঘটলো। নির্বাক হয়ে তাকিয়ে থাকলো নবীনের দিকে। নবীন ভৈরবীর হাত ধরে টান দিয়ে বললো, চলে এসো।

—আমি যাব ? তুমার সাথে ?

জড়িত স্বর বেরিয়ে এলো ভৈরবীর কণ্ঠ থেকে।

—হাঁ। এস।

এ হুকুম অমান্য করবার শক্তি নেই বোধহয় ভৈরবীর। সে যেন একটা প্রাণহীন যন্ত্র। যন্ত্রের মতই টলতে টলতে চললো ভৈরবী। কয়েকটা লোক টিট্‌কারি দিল।

নবীন ভৈরবীকে নিয়ে এলো একটা ফাঁকা জায়গায়। একটা পুকুরের পাড়ে। অর্জ্জুন এলো সঙ্গে। ভৈরবীর শুশ্রূষা করা দরকার।

নবীন বললো, এইখানে শুয়ে থাক। উঠোনা।

—উঠবো নাই ?

—না।

—বেশ শুলুম।

শুয়ে শুয়েই ভৈরবী জড়িত স্বরে বেসুরো গলায় গাইলো একটা অর্থহীন গান—"বিহানকে মার‍্যাছে কাড়াতে হে, বিয়ানকে মারেছে কাড়াতে"—

নবীন তার উত্তরীয় জলে ভিজিয়ে এনে ভৈরবীর মাথায় মুখে দিয়ে বললো, তুমি ঘুমাও ভৈরবী।

—তুমি কাছে বৈশ, তবে ত ঘুম আসবেক।

নবীন বললো, তুমি চুপ করো।

রুখে উঠলো ভৈরবী, চুপ কৈরব ক্যানে ? ক্যানে চুপ কৈরব।

—চুপ না করলে এই পোখোরের গাবায় পুতে দিয়ে যাব তুকে।

কেঁদে উঠলো ভৈরবী। এখনো নেশা কাটেনি। নবীন বার বার জল এনে ওর মাথা ধুইয়ে দিল। গায়ের বসন ভিজে গেল ভৈরবীর। অন্তর বাস শিথিল হয়ে যাওয়া ভৈরবীর সৌন্দর্যটুকু চোখে পড়লো নবীনের। সব কিছু ভুলে নবীন সেই সৌন্দর্যটুকুকে দৃষ্টি দিয়ে উপভোগ করলো। ভৈরবী ভয় পেয়ে গেছে যেন, সে একটু নিরাপদ আশ্রয় চাইলো। জড়িয়ে ধরলো নবীনের পা ছুটিকে। নবীন বললো, তুমি ঘুমোও। কতক্ষণ এমনি ছিল জানে না নবীন। অর্জ্জুন চলে গেছে মেলা দেখতে। ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়ায় অসাড় হ'য়ে এসেছে ভৈরবীর দেহখানি। গভীর নিদ্রায় অচৈতন্য ভৈরবী।

কিন্তু সে একী করছে ? নবীনকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে আছে ভৈরবী, আর নবীনও বসে আছে ঠায় ? কেউ যদি দেখে। নেশা ছেড়ে গেলে ভৈরবীই যদি—না, এ পথ তার পথ নয়। ভৈরবীর হাত দুটি আস্তে আস্তে ছাড়িয়ে দিয়ে উঠে পড়লো নবীন। আর এখানে নয়—এ মেলায় নয়। কাকেও কিছু না বলে, কারো সঙ্গে দেখা না ক'রে সোজা চলে এলো নবীন ইষ্টিশনে।

চার

—একী ছোট গুঁসাই যে! এ যে আমাবস্যায় চাঁদ গো। মালিনী আনন্দে করতালি দিয়ে গান জুড়ে দিল নবীনকে দেখে।

অসময়ে চাঁদের
আজি আমার, কি শুভোদয়—

ও রাধা, ও খেঁদী!

সত্যই এই অসময়ে আসা তার ভালো হয়নি। কিন্তু না এলেও যে উপায় ছিল না। আশ্রমে ফিরে গেলে, গ্রামের লোক এসে ভীড় জমাতো, হয়ত কৈফিয়ৎ তলব করত ভৈরবীর মা—কেন নবীন ভৈরবীর অঙ্গ স্পর্শ করেছিল ? একটা অপবাদ রটে যেত গ্রামের মধ্যে, নবীন যদি প্রতিবাদ জানাতো তবে হয়ত কেউ তা বিশ্বাস করত না। তার চেয়ে পালিয়ে এসেই ভালো করেছে। রাধা ও খেঁদী এসে উপস্থিত হলো।

—কই বল্লে না ত ছোট গুঁসাই, কি মনে ক'রে আস্যাছ ? আবার জিজ্ঞেস করলো মালিনী।

রাধা একটা আসন পেতে দিল নবীনের বসবার জন্য।

—গোঁসাইজীকে দেখতে ইচ্ছা হলো, তাই এলুম। উত্তর দিল নবীন।

—ই কথা সত্যি লয় ছোট গুঁসাই।

—কে বল্লে ?

—তুমার মুখ বলছে। চোখ দুটো জবা ফুলের মতন লাল, চোখের কোলে কালো ছায়া। ওলো রাধা, লক্ষণ ভালো নয়রে! কুথাই ছিলে সত্যি বল দেখি ছোট গুঁসাই। বললো মালিনী।

নবীন বললো, আমি এখনো মুখে জল দিইনি ;

—ওমা তাইত। ও খেঁদী, দে, জল-গামছা আন্যা দে। ও রাধা যা, চা কর দেখি!

তাইত, এ যে রাধারই ভুল! চলে গেলো রাধা। চলে যেতে যেতে শুনলো মালিনী নবীনকে বলছে, মুখপুড়ী নূপুরের ধ্বনি শুনে সব ভুলে গেইছে।

নবীন বেশ ভালো করে হাত মুখ ধুয়ে এসে বসলো উঠানের এক পাশের শিউলি গাছটার বেদীর উপর। গাছটা নিয়ে এসেছিলেন গোঁসাইজী। নবীন লাগিয়েছিল একে। বেশ একটু বড় হলে তার চারধারে ইট আর মাটি দিয়ে একটা বেদী গড়ে তুলেছিল নবীন। এখন বেশ বড়ো হয়েছে গাছটা। দেখতেও বেশ সুন্দর হয়েছে। গোঁসাইজীর আশ্রম-টির গৌরাঙ্গ আলয়। সুন্দর জায়গাটি—চারি পাশেই শাল মহুয়ার বড়ো বড়ো বৃক্ষ। ঋতু পরিবর্তনের সাথে সাথে আশ্রমের সৌন্দর্যের রূপের পরিবর্তন ঘটে। বসন্তে কোকিল ডাকে, বর্ষায় মেঘ এলে আশ্রয় নেয় শাল-মহুয়ার মাথায়। বৈশাখে রুদ্রবীণায় ধ্বনিত হয় নটরাজের নূপুর নিক্কম। দূরান্তের পানে তাকিয়ে কি যেন দেখছিল নবীন। এই সময়ে রাধা এসে বললো, তুমার জায়গা হুঁয়্যাছে ছোটগুঁসাই।

এই আশ্রমের নিয়ম এই, এখানে যা কিছু গ্রহণ করো তাই আসনে বসে নিবেদন ক'রে গ্রহণ করতে হবে।

রাধার মুখের পানে তাকালো নবীন। রাধা সেজেছে।

অনাড়ম্বর পরিচ্ছন্ন সাজ। আট-সাঁট ক'রে চুল বেঁধেছে রাধা কপালে দিয়েছে চন্দনের ফোঁটা। দু হাতে পরেছে এক গাছা করে পাৎলা রূপোর চুড়ি। এতেই সুন্দর মানিয়েছে রাধাকে। এর বেশী হলে হয়ত রাধাকে খুঁজে পাওয়া যেতনা।

—বড়ো গোঁসাই কোথায় রাধা? জিজ্ঞেস করলো নবীন।

—আমি ঠিক জানিনা, দিদি জানেন। চা ঠাণ্ডা হুঁয়ে যাবেক যে

—যাই। সেদিন রাস্তায় তোমাদের কষ্ট হয় নাই ত? হয়েছিল বৈকী। সারাটা পথ শুধু একজনের মুখ খানাই রাধার মনের মুকুরে প্রতিফলিত হতে দেখেছিল রাধা। বৃন্দাবনের রাধা নাকি বিরহ যন্ত্রণায় যমুনায় আত্মবিসর্জন করতে চেয়েছিল, তমালকে আলিঙ্গন ক'রে জানিয়েছিল আপনার মনের বেদনা, এ রাধারও হয়েছিল সেই দশা। সেও চেয়েছিল একজনকে। সে ওই ছোট গোঁসাই। বিরহ কি—তাই উপলব্ধি করেছিল রাধা।

রাধা বললো, না, চল খেয়ে নিবে। সারারাত্রি ত বোধহয় খাওয়া হয় নাই।

—কি করে জানলে?

—ও আবার বলে জানাতে হয় নাকি? মুখ দেখলে বুঝতে পারা যায় না?

বড়ো মিষ্টি স্বর রাধার। ওর কথায় যেন রাগিনী খেলা করে।

উঠলো নবীন।

আসন করে খাবার বেড়ে রেখেছিল রাধা। একটা থালে কিছু মুড়ি, একটা ছোট্ট বাটিতে কিছুটা গুড়, পাশে একটি গ্লাসে এক গ্লাস জল।

—এ সব কেন রাধা?

—আমি জানিনা, দিদি বলেছে, আমি দিয়েছি।

—কই তোমাদের দিদি!

—বাইরে গেল। আমি আসছি। উঠে গেলো রাধা। যখন ফিরে এলো তখন নবীনের খাওয়া হয়ে গেছে। নবীন হাত ধুয়ে বসেছিল। রাধা ওকে বসে থাকতে দেখে বললো, আর কিছু লিতে নাই?

—না।

—বিছানা ক'রে দিয়েছি, এবারে শুবে যাও। আশ্চর্য হলো নবীন। এইটির প্রয়োজন ত অনেক আগেই উপলব্ধি করেছিল নবীন। অথচ বলতে পারেনি। কি করে মনের কথাটি জানল রাধা?

নবীনের ঘুম আপনা থেকে ভাঙেনি; ভাঙিয়ে দিয়েছে মালিনী—

—ও ছোট গুঁসাই, বাবারে বাবা, কি ঘুমাতেই পারো, রাত হৈল যে, ইবারে উঠ।

নবীন চোখ রগড়ে নিয়ে তাকিয়ে দেখলো বাইরের পানে। সত্যিই তাই—সন্ধ্যা এসে নেমেছে আশ্রমকে ঘিরে।

—আগে উঠাও নাই কেন মালিনী ?

—না উঠাই নাই ? যেমন কুম্ভকর্ণ। কী ঘুম।

উঠে বসলো নবীন। মালিনী বললো, বড়ো গুঁসাই তুমার অপেক্ষায় বাইরে বসে আছেন।

—কখন ফিরলেন ?

—খানিক আগে। আমি যাই গৌরাঙ্গের ভোগের ব্যবস্থা করিগা। তুমি যাও, বড়ো গুঁসাই ডাকছেন।

নবীন চোখে মুখে জল দিয়ে এসে দণ্ডবৎ করলো গোঁসাইজীকে। সত্যই গোঁসাই উনি। যেমনি সৌম্য মূর্তি, তেমনি মিষ্টি স্বভাব। শুভ্র কেশ কাঁধ পর্যন্ত, দীর্ঘ শ্মশ্রু! সারা মুখমণ্ডলে একটি শান্ত ভাব।

—শরীর বড়ো রোগা হয়ে গেছে তোমার। অসুখ করেনি ত ?

—না।

—আপনার শরীর ত অনেকখানি শুকিয়ে গেছে।

—আমাদের এখন ত শুকোবারই সময় বাবা। একটা বয়স থাকে যখন সব কিছু থেকে রস টেনে সে আপনার জীবনী শক্তিকে বাড়ায়, আপনার স্বাস্থ্যকে সুন্দর করে তুলে, কিন্তু সেই বয়সের কোঠা যখন অতিক্রান্ত হয়, তখন তার শিকড় আর রস টানতে পারে না, যা সঞ্চয় করে, তাই ক্ষয় করতে হয়। আমার এখন সেই অবস্থা। বড়ো গোঁসাই চোখ বন্ধ করে থাকলেন খানিক, যেন অন্তরের মধ্যে কাদের দেখলেন, কাদের সাহচর্য অনুভব করলেন। নবীন গোঁসাইজীর মুখ পানে তাকিয়ে নীরবে বসে থাকলো।

মালিনীর আরতির আয়োজন সমাপ্ত হয়ে ছিল—সেও এসে বসলো নবীনের পাশে।

বড়ো গোঁসাই চোখ খুলে বললেন, যতই দেখছি ততই দুঃখ পাচ্ছে নবীন। মানুষের চেয়ে সুন্দর ত কিছু নাই। মানুষ আছে—তাই পৃথিবী সুন্দর! কিন্তু সেই সুন্দরের মধ্যেও কীট আশ্রয় করেছে। সেই কীট কুরে কুরে খাচ্ছে মানুষের সৎ প্রবৃত্তিগুলিকে, সুন্দরকে করে দিচ্ছে

কুৎসিৎ, শুধু কি তাই—এই কীট মানুষের জীবনীশক্তিকে পর্যন্ত খেয়ে ফেলছে।

নবীন বুঝলো না এই ভাবের কথা। সে যেমন নির্বাক হয়ে তাকিয়ে ছিল, তেমনি তাকিয়ে থাকলো।

মালিনী স্মরণ করিয়ে দিল, ঠাকুরের আরতির সময় হয়েছে। উঠে পড়লেন বড়ো গোঁসাই, নবীন, মালিনী, রাধা, খেঁদী সবাই অনুসরণ করলো গোঁসাইজীকে।

আরতি হয়ে যাওয়ার পর, ঠাকুরের সামনে একতারা নিয়ে বসলেন গোঁসাই। নবীনকে বললেন, ওই যে মূর্তি দেখছ বাবা, ও আমার এই পৃথিবীর দেবতা। উনি এই বিশ্ব মানবের প্রতীক। সেই প্রতীককে পূজো করি আমরা, যাতে বিশ্ব মানবের সেবা করবার প্রবৃত্তি হয়, তাই। একটু নীরব থাকলেন গোঁসাই। সবাই নীরব থাকল। পরের উপদেশটি শুনবার জন্য।

ক্ষণপরে গোঁসাই বললেন, অনেক দিন তোর গান শুনিনি নবীন।

নবীন যেন ধন্য হয়ে গেল। গোঁসাইজী গান শুনতে চাইছেন—এ যে অতি বড়ো ভাগ্যের কথা।

নবীন গাইলো—

ক্ষ্যাপা মন দেবতাকে খুঁজিস কোথা মন্দিরে।
ওরে তোর দেবতা ছড়িয়ে আছে এই বিশ্ব ভুবন ঘিরে।

গভীর অনুরাগে গাইলো নবীন। মুগ্ধ হয়ে শুনলেন গোঁসাই। গান শেষ হয়ে গেলে নবীন গোঁসাইএর পা ছুঁয়ে প্রণাম করলো।

রাত্রের খাওয়া-দাওয়ার পর গোঁসাই বললেন, শুয়ে পড়গে বাবা, কাল সকালেই তোমাকে উঠতে হবে। বড়ো সুসময়ে এসেছ নবীন। নবীন আরো কিছু শুনবার আশায় তাকিয়ে থাকলো গোঁসাইজীর মুখের দিকে।

—তোমার আসার পিছনে হয়ত কোনো কারণ আছে নবীন। তোমাকে দিয়ে কোনো উদ্দেশ্য সাধন করতে চান ঠাকুর।

—কি উদ্দেশ্য ?

—কি করে বলব বাবা। কি কথা বলতে গিয়ে থেমে গেলেন

গোঁসাই, বেশ বোঝা গেল তিনি যেন কি গোপন করছেন। নবীন আর কোনো প্রশ্ন করলো না। গোঁসাইজীর নির্দেশ মতই শুতে গেলো।

এখানের বাসিন্দারা অতি প্রত্যুষেই শয্যা ত্যাগ করে। নবীনকে জাগিয়ে দিতে হলো পরদিন ভোরে। রাধাকেই পাঠিয়ে দিয়েছিল মালিনী। রাধা নাকি প্রথমে একটু মৃদু আপত্তি করেছিল। মালিনী বলেছিল, ও লো, পেটে ক্ষিদা মুখে লাজ ক্যানে? চোখে দেখবার জন্য ত মরে যাস। হাতের কাছে পাঁয়্যাছিস যখন--তখন টান দে লো, টান দে।

রাধার মুখখানা সরমে রাঙা হয়ে উঠেছিল। টান দিলেই সে কি আসবে? নবীন ত তেমন হালকা নয়! ওর মন বলেছিল, দোষ কি? দেখনা চেষ্টা ক'রে। রাধা বলেছিল, চেষ্টা করতেও যে তার লজ্জা লাগে। কী ভাববে সবাই। বলবে না কি, যে রাধা চিরকালই একই রকম থাকল। মন ত দিয়েছিল এক জনকে। সর্বস্ব দিয়েছিল তাকে —ভালোবেসেছিল, দেহটা সমর্পণ করতেও ত দ্বিধা করেনি। অপবাদ রটেছিল, ভ্রূক্ষেপ করেনি। কিন্তু যার জন্য নিজের মাতৃত্বের কলংক রটেছিল, কি পেয়েছিল তার কাছে? রাধা কাতর ভাবে বলেছিল, আমাকে তুমি বিয়ে কর। সে বলেছিল, তা হয় না রাধা। তোমার গর্ভস্থ সন্তানকে মেরে ফেলা ছাড়া উপায় নেই। আমার সম্মান লোকচক্ষে হেয় হতে দিতে পারি না। রাধার মন জানে এ সব, তবু সে বলেছিল,—সবাই ত আর সমান নয় রাধা। মাটির গুণে, গাছের ফলের গুণাগুণ দেখা যায়।

—কি লো দাঁড়াই থাকলি যে? বললো মালিনী।

—তুমিই যাও দিদি, আমি বরং তোমার কাজগুলি করে দিছি।

—আ পোড়ারমুখী, আমার যা কাজ তাই ত আমি করছি। রাধাকে এক রকম ঠেলেই পাঠিয়ে দিল মালিনী।

অনেকবারই রাধা এসেছে নবীনের কাছে। নানা প্রয়োজনে তার সঙ্গে কথা বলেছে, কিন্তু আজ এই মুহূর্তে ওর পা দুটো কে যেন বার বার জড়িয়ে ধরছে।

আকাশে দিনের প্রথম সূর্য দিঙমণ্ডল রাঙিয়ে দিয়ে। সে রঙ এসে

লেগেছে গোঁসাইজীর আশ্রমের এই প্রকোষ্ঠে। রাধার হাত কাঁপছে, কাঁপন ধরেছে ওর দেহে। কেমন করে জাগাবে রাধা নবীনকে? রাধার মনের মানুষটি খোঁচা দিয়ে উঠলো, যাকে মনে মনে গ্রহণ করেছিস, তাকে স্পর্শ করতেই বা দোষ কি রাধা? রাধা বললো, যদি কিছু মনে করেন উনি? রাধার মন বললো, নবীনও মানুষ। ভয় কি? উর্বশী বিশ্বামিত্রের মন হরণ করেছিল আর তুই—

মালিনী বাইরের থেকে হাঁক দিলো, ছোট গুঁসাই! ও ছোট গুঁসাই!

—চোখ মেলে তাকালো নবীন।

—রাধা?

—বড়ো গুঁসাই ডাকছেন।

—তাইত, বেলা হয়ে গেছে। আমাকে আগে তুলে দাওনি কেন রাধা? ছিঃ ছিঃ, গোঁসাইজী কি ভাববেন। নবীন উঠে গেলো বাইরে।

পাঁচ

—গোঁসাইজী!

গোঁসাইজীর আশ্রম থেকে মাইল চার উত্তরে কালোপাথর গ্রাম। পাকা রাস্তা নেই, ক্ষেতের আল উঁচু নীচু মাঠ পেরিয়ে যেতে হয়। এখানের সবই কৃষ্ণবর্ণ, মানুষ থেকে মাটি পর্য্যন্ত কালো।

ইদানীং মাঠ ক্ষেত ভেঙে কালো মাটি বিছিয়ে দিয়ে একটা রাস্তা হচ্ছে। সবাই বলে, সাহেবী রাস্তা। সাহেবের গাড়ী ওই পথ দিয়ে যাওয়া আসা করে। কালো পাথর গ্রামের মাটির তলে কালো মাণিক আবিষ্কৃত হয়েছে, পাতালপুরী থেকে সেই মাণিক তুলে এনেছে সাহেব। কল বসেছে—হয়েছে কলিয়ারী। বাইরের মানুষ এসেছে, মজুরদের জন্য হয়েছে লম্বা লম্বা ধাওড়া। অফিস, কর্মচারী, হলেজ পাম্প— ট্রাম লাইন বসেছে। সেই লাইনের উপর দিয়ে টব্ গাড়ীতে কয়লা বোঝাই হয়ে আসছে। কালো পাথরের বনেদী মানুষগুলি ছিটকে

পড়েছে একপাশে। আজ কালো পাথর বলতে—কলিয়ারীকেই বোঝে সবাই। গোঁসাইজী এ অঞ্চলে বিশেষ পরিচিত।

কলিয়ারী অঞ্চলে ঢুকবার মুখেই কিছু লোক বসে জটলা করছিল, তাদের চোখে-মুখে একটা আসন্ন বিপদের ছাপ। গোঁসাইকে দেখেই তাদের একজন ডাক দিতেই গোঁসাইজী বললেন, কিছু বলছ বাবা!

—আজ আবার এখানে এলেন কেন গোঁসাইজী।

—ফিরেই যান। আর একজন বললো।

গোঁসাইজী হাসতে হাসতে বললেন, ভিক্ষা মিলবে না বলছ?

—অবস্থা ভালো নয় গোঁসাইজী। কলিয়ারীর মানুষগুলোর মাথা খারাপ হয়েছে। শুনছি নাকি দাঙ্গা বাধবে।

নবীন একবার তাকালো গোঁসাইজীর দিকে।

গোঁসাইজী জিজ্ঞেস করলেন, কেন বাবা?

একজন উত্তেজিত হয়ে বললো, ওই ব্যাটা সাহেব কোথা থেকে মুসলমান নিয়ে এসেছে, আর তারা গোরু কাটতে আরম্ভ করেছে।

গোঁসাইজী বললেন, এরই জন্য দাঙ্গা হবে?

—শুধু কি গোরু কাটা? কাল শিব মন্দিরে গোরুর মাথা ফেলে দিয়ে গেছে! হিন্দু হয়ে এসব অত্যাচার কি সহ্য করা যায়?

—তা ত বটেই। গোরু ভগবতী, দেবী। সেই দেবীর মাথা আবার শিব মন্দিরে? দেবতার আলয়ে? ব্যবস্থা একটা করা দরকার বইকি! আচ্ছা আসি বাবা।

নবীনকে নিয়ে কলিয়ারী অঞ্চলেই এলেন গোঁসাইজী। রাস্তার ধারেই গড়ে উঠেছে একটা মসজিদ—সেখানেও তেমনি কিছু মানুষ—এদের মুখেও সেই একই ছাপ।

গোঁসাইজী এগিয়ে গিয়ে বললেন, কি হে মকবুল মিঞা, এখানে বসে যে! কাজ কারবার নাই নাকি?

মকবুল কথাটি কইলোনা নবীনের সঙ্গে।

গোঁসাইজী বললেন, তোমরাও ছুরি শানাচ্ছ নাকি মিঞা?

—মসজিদে শুয়োরের মাথা পড়লে, শানাতে হবে বৈকী। উঠে গেলো লোকগুলি।

মকবুল একটা কথাও কইলো না গোঁসাইজীর সঙ্গে।

গোঁসাইজী একটা দোকানে এসে উঠলেন। এখানে এলে এইখানেই ওঠেন উনি। দোকানী খাতির করে। বসতে দেয়। তত্ত্ব কথা শোনে।

দোকানী গোঁসাইজীকে দেখে বললো, শুনেছেন সব গোঁসাইজী?

—শুনেছি।

—এ গ্রামে, এসব দাঙ্গা-হাঙ্গামা কখনো হয়নি গোঁসাইজী। যদি সত্যিই দাঙ্গা বাধে তখন?

সত্যই সমস্যা।

মানুষই মানুষের রক্ত খাবে? একটু চিন্তিত দেখা গেলো গোঁসাইজীকে।

দোকানী বললে, আপনারা আজ চলেই যান গোঁসাইজী।

—গান গাইতে এসেছি, যাব কি রকম ভাই!

—এখন কি গান শুনবার মন আছে কারো?

—তবু শোনাতে হবে বৈকী।

গোঁসাইজী সারাটা দিন সেইখানে থাকলেন। পুরো একটা দিন—একটা রাত্রি কাটিয়ে ফিরে এলেন আশ্রমে। গোঁসাইকে একলা দেখে রাধার বুকটা ছ্যাঁৎ ক'রে উঠলো। না-পাওয়ার দুঃখ আছে কিন্তু পেয়ে হারানোর ব্যথা অসহনীয়। রাত্রির রান্নার যোগাড় করছিল মালিনী। রাধা গিয়ে বললো, বড়ো গোঁসাই ফিরে আস্যাছেন দিদি। —আর ছোট গুঁসাই?

—সঙ্গে ত দেখলাম না। বোধ হয় চলে গেলেন।

—রাধার গলার স্বর ভারী ভারী ঠেকল।

—কি করে জানলি? জিজ্ঞেস করলো মালিনী।

—জানাই আছে। কি খেয়াল হয়েছিল, আসেছিলেন এখানে। থাকতে ত আসে নাই।

—তবে তুই কেমন মিয়া লো, এক ট পুরুষকে ধরে রাখবার ক্ষ্যামতা নাই তোর। রাধা কোনো জবাবই দিল না। চোখ দুটি ছল ছল করে উঠলো তার।

মালিনী ডাকলো, রাধা! এবারেও কোনো জবাব দিল না রাধা।

রাধার দিকে তাকাতেই রাধার বেদনা-বিধুর মুখখানা চোখে পড়লো মালিনীর। মালিনী বললো, কাঁদছিস নাকি পোড়ারমুখী! তাহলে তুই সত্যিই মরেছিস রাধা।

রাধা বললো, তুমি একবার বড়ো গোঁসাইকে শুধাবে দিদি ?

—তাই যাই, না হলে সারা রাতে ত আর ঘুমাবি নাই।

মালিনী বড়ো গোঁসাইএর খাবার করে—খেতে দিল জায়গা করে। মালিনী খাবার দিয়ে বসলো সামনে। দরজার গোড়ায় গিয়ে দাঁড়ালো রাধা কান খাড়া করে। ছোট গুঁসাই কি ওই পথেই চলে গেল নাকি ? জিজ্ঞেস করলো মালিনী।

—একটা বিপদের মুখে রেখে দিয়ে এসেছি ওকে মালিনী। বুকটা কেঁপে উঠলো রাধার।

—সে আবার কি ? জিজ্ঞেস করলো মালিনী।

বড়ো গোঁসাই কালো পাথরের সমস্ত ঘটনা বিবৃত করে বললেন, এ ছাড়া কি আর করা যেত।

—যদি ওরা ছোট গোঁসাইকেই—বলতে গিয়ে থমকে গেলো মালিনী। রাধার বুকের স্পন্দন গেলো বেড়ে। এবার বোধ হয় পড়ে যাবে রাধা। সে শক্ত করে ধরে থাকলো দরজার চৌকাট।

—কিন্তু মানুষের এত বড়ো বিপদে আমরা ত স্থির নিশ্চেষ্ট থাকতে পারি না মালিনী। মানুষের থেকে আমাদের কাছে কেউ বড় নয়। মানুষকে বাঁচাতে গিয়ে যদি প্রাণই দিতে হয় নবীনকে—দিতে হবে।

এবার আর আপনাকে সামলে রাখতে পারলো না রাধা। ডুকরে কেঁদে উঠলো। দাঁড়িয়ে থাকার সাহস নেই তার। টলতে টলতে গিয়ে শুয়ে পড়লো।

রাত্রি কাটলো উৎকণ্ঠায়। সারা রাত্রির মধ্যে একটা বার ঘুমুতে পারেনি রাধা। চোখ বন্ধ করলেই একটা বীভৎস, ভয়ঙ্কর ছবি ফুটে উঠে। আঁৎকে উঠে রাধা। সম্ভাব্য বিপদের আশংকায় মুখ শুকিয়ে যায়—চোখে জল আসে। কিন্তু কেন এই চোখের জল ? ক'দিনেরই বা পরিচয় নবীনের সঙ্গে, তারই মধ্যে এমন করে কি ভাবে নিজেকে হারিয়ে ফেললো রাধা। বেশ ছিল এই আশ্রমিক জীবনধারা। এখানে

এসে অতীতের বেদনাকে, অপমানিতের মরম ব্যথা ভুলেছিল রাধা। দৈনন্দিন কাজের মধ্যে আপনাকে ডুবিয়ে রেখেছিল,—কী জন্য গিয়েছিল সে নবীনের আখড়ায়? না গেলে ত আজ এমন ভাবে কাঁদতে হতোনা!

ভোরের দিকে হয়ত একটু ঘুমিয়েছিল রাধা, ঠিক ঘুম নয়,—হয়ত একটু তন্দ্রা এসেছিল, তাই বেলা হয়েছিল বিছানা থেকে উঠতে। অন্য দিন হলে মালিনী ওকে ধমক দিত—ঠাকুরের বাসি বাসন পড়ে আছে, সকালেই গোঁসাইজী স্নান সেরে নেন,—তার জন্য জল তুলে রাখা আছে, ঘর-দোরে ঝাঁট দেওয়া, ফুল তুলে এনে ঠাকুরের জন্য মালা করা ইত্যাদি অনেক কাজই সকালে করতে হয় রাধাকে। এসব কিছুই করা হলোনা আজ। মনে মনে লজ্জিত হলো রাধা। আরো বেশী লজ্জা পেলো, মালিনী তাকে তিরস্কার করলো না দেখে।

—দিদি, গোঁসাইজীর চান হুঁয়্যাছে? ধীরে ধীরে জিজ্ঞেস করলো রাধা।

—আজ সিনান্ না করেই চল্যে গেইছেন। কোনো জবাব দিল না রাধা।

মালিনী বললো, তাই কি থাকতে পারে কেউ—আর বড় গুঁসাই এর ত কথাই নাই। তুই তখন আসিস নাই রাধা, তখন এই আশ্রমে সকাল সন্ধ্যায় বসত মানুষের হাট। আশেপাশের গাঁয়ের লোক আস্তা জমা হতো এই ঠ্যানে। এই বলে মালিনী স্বরু করলো আশ্রমের পূর্বের ইতিহাস।

শুধু কি মেলাই বসত—শুধু কি গান-বাজনাই চলত আখড়ায়? না, তা নয়; কতো বিষয়ের আলোচনা হত সেখানে। গোঁসাইজী বলতেন, ওরা শুনতো। মনে আছে মালিনীর—সেবার মনোহরপুরের রাজেন মণ্ডল আর আরো কয়েকজন বলেছিল, শুনেছেন গোঁসাইজী?

—কি রে।

—আমাদের ঘরে দুটি ধান-চাল থাকবারও উপায় নাই।

আশ্চর্য হয়েছিলেন গোঁসাইজী। বলেছিলেন, তা কি রে। তোরা চাষী, তোদের ঘরেই ত ধান-চাল থাকবে।

—না থাকবেক নাই। এই নাকি আইন।

—তাই আবার হয় নাকি! হেসে উঠেছিলেন গোঁসাইজী। রাজেন সবিস্তারে সব বলেছিল,—মনোহরপুর গ্রামে সব থেকে বেশী জমির মালিক খাঁ রা। সাধু খাঁ, হরি খাঁ রা। বন্ধকী কারবার করে, সুদের কারবারে বেশ জমি হাতিয়ে নিয়েছে ওরা। সেই খাঁ-রাই বলেছিল, তাদের জমি থেকে নাকি রাজেন ধান চুরি করে এনে রেখেছিল তাদের খামারে। পুলিশ এসেছিল। তল্লাস করেছিল রাজেনের খামার। রাজেন পুলিশের কর্তাকে বলেছিল, না হুজুর ই ধান আমার ক্ষেতের।

—দেখ রাজেন, আমি এই অঞ্চলে আজ তিন বছর হতে চল্লো আছি, তোর খামারে এত ধান কখনো দেখিনি।

—এবার বিধাতা মেপেছেন ভালোই, তাই এসেছেন লক্ষ্মী ঠাকরুণ। বলেছিল রাজেন।

—মানতে পারলাম না রাজেন, উত্তর দিয়েছিলেন দারোগা। এ ধান আমি নিয়ে যাবো থানায়।

—বেশ হিসাব করে নিয়ে যান, কোন্ ধান কত আছে। উত্তর দিয়েছিল রাজেন।

সেদিন দারোগা আর কিছু না বলেই চলে গিয়েছিলেন সে দিনের মত। গোঁসাই আপনার মনেই বলেছিলেন, আবার আসবে ওরা। গোঁসাইজী মনে মনে অভিশাপ দিয়েছিলেন দারোগার কাজ-কর্মে।

—শুন রাজেন, তারা আবার আসবে, কিন্তু ধান তুই কিছুতেই হাত ছাড়া করিস না রাজেন।

—আপনি একবার খাঁ-দের কাছে যাবেন ঠাকুর?

—গেলে তোর যদি উপকার হয়, ত যাই। কিন্তু তা হবে না বলেই আমার ধারণা। খাঁ-রা কারো কথাই শুনচে না। তারপর খানিক চুপ করে থেকে একটু পরেই দৃঢ় ভাবে বলেছিলেন, ওদের কাছে আবেদন করতে গেলে ওরা ভাববে তোদের অপরাধী। যদি বলিস, তবে আবার যদি দারোগা আসে তখন গিয়ে দাঁড়াবো দারোগার সামনে। মোকাবিলা যদি করতে হয়, তাদের সঙ্গে করাই ভালো।

রাজেন খুশি হয়েছিল গোঁসাইএর কথা শুনে। সে বলেছিল, আচ্ছা।

কিন্তু গোঁসাইকে ডাকবার অবসর হয় নাই রাজেনের। দিন কয়েক পরে ফৌজ নিয়ে এসে দারোগা লুঠ করে নিয়ে গিয়েছিল—বাধা দিয়েছিল রাজেন; আর এই বাধা দিতে গিয়েই শেষ হয়ে গিয়েছিল রাজেন ওদের গুলিতে। সেদিন গোঁসাইজী আর থাকতে পারেননি আখড়ায়। সারাটা রাত কাটিয়ে এসেছিলেন রাজেনের ঘরে। লোক জন ডেকে হেঁকে বলেছিলেন—

ওরে এই পৃথিবীর আলো হাওয়ায়
এই মাটিতে ফসল পাওয়ার—
তোদেরও আছে সম অধিকার
প্রতিষ্ঠা কর তারে ॥

মানুষগুলো কেমন যেন হয়ে উঠেছিল। আখড়ায় ওদের কথাবার্তা শুনে চমক লাগতো মালিনীর। মালিনী তাই বললো, বিপদ যখন কোথাও আসে তখন গোঁসাইজীকে ঘরে রাখা যায় না রাধা। আমিও জানতে পারি নাই, কখন উনি উঠে চলে গেইছেন।

—কুথাকে গেলেন ?

—ঐ কালো পাথরের দিকেই।

—ফিরবেন ত ?

—কি জানি কখন ফিরবেন।

সারাটা দিন নানা ভাবনা চিন্তার মধ্য দিয়ে কেটে গেলো। সন্ধ্যায় আখড়ায় ফিরে এলেন গোঁসাইজী। গোঁসাইজীকে দেখলেই বোঝা যায় কিছু একটা অঘটন ঘটেছে। নবীনের কথা জানবার জন্য ব্যাকুল হলেও, মুখ ফুটে কেউই কিছু প্রশ্ন করতে ভরসা পেলো না। তারা চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলো এক পাশে।

গোঁসাইজী বললেন, আমার গামছা আর থলিটা ঠিক ক'রে রেখে দিস মালিনী। কাল সকালেই বেরুতে হবে।

মালিনীরা ভরসা পেলো কিছু বলতে।

মালিনী জিজ্ঞেস করলো, একাই যে ফিরে এলেন গোঁসাইজী ?

—যা আশংকা করেছিলাম তাই হয়েছে মালিনী।

—কি হয়েছে ? উদ্বেগ ব্যাকুল কণ্ঠস্বর বেরিয়ে এলো রাধার।

গোঁসাইজী বললেন, সবই বলছি।

আরম্ভ করলেন গোঁসাইজী। যেদিন নবীনকে রেখে এলেন, সেই দিনই সন্ধ্যার দিকে দাঙ্গার আগুনের ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে পাকিয়ে কালো পাথরের সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়েছিল। মানুষ আতংকে অর্দ্ধমৃত প্রায়। এমনি সময়েই যে দোকানে নবীন বসেছিল সেইখানে খবর এসেছিল একটা খুনের। কাজে যাচ্ছিল মানুষটি, হঠাৎ কে বা কারা তাকে পিছন দিক থেকে ছুরি মারে। এ কথা শোনার পর নবীন দোকানীকে বলেছিল, গানের একটা আসর হয় না দোকানী ?

—এই সময় কে তোমার গান শুনবে বাউল ? বলেছিল দোকানী।

—শুনবে না, কিন্তু আমাকে যে শোনাতেই হবে।

—সাধে লোকে তোমাদের পাগল বলে, দেখছ না লোকগুলো কেমন হিংস্র হয়ে উঠেছে, তুমি গান গাইতে গেলে আরো একটা বিপত্তি না হয়ে যায়।

—যাই হোক, তবু আমাকে যে বলতেই হবে আমার মনের কথাটি। দোকানীর বাধা দেওয়া বিফল হয়েছিল। নবীন একলাই বেরিয়ে পড়েছিল বাইরে, এবং একতারা আর কণ্ঠ সম্পদ নিয়ে রাস্তার চৌমাথার উপর সাধারণের অবসর বিনোদনের জন্য সিমেণ্ট বাঁধানো বেদীটায় দাঁড়িয়ে গেয়েছিল—

ভজ ভজ মানুষ ভগবান।
মানুষ ভজলে পাবি নন্দের নন্দন
সে যে সদা বর্তমান।

জনশূন্য পথ, কখনো কদাচিৎ একটি দুটি মানুষকে যাতায়াত করতে দেখা যায়, তারাই ভয়ে ভয়ে ক্ষণিক দাঁড়িয়ে শুনে,—নবীন আপন খেয়ালে গেয়ে চলেছে,

মানুষ রূপে গুরু, বাঞ্ছা কল্পতরু
মানুষ রত্ন পায়, মানুষ ডুবুরু
মানুষের আছে অতিক্রম উরু
(আগে) মানুষের গুরু মানুষকে জান।

পাশাপাশি ঘরের মেয়েরা দরজার আড়াল দিয়ে ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে

থাকলো,—বেশ গাইছে বাউল। কিছু লোক বেরিয়েও এলো বাইরে. আত্মহারা হয়ে গেছে নবীন। সে নেমে পড়লো বেদী থেকে, চললো এগিয়ে, কণ্ঠে-ওর গান, হাতে একতারা, নবীন গাইছে—

গোঁসাই বলেন কথা, শোনরে বাউল,
মানুষ বটে সত্য ভজনের মূল
এই মানুষ বাগানে মনের ফুল তুল
মানুষ মন্ত্রে কর ফুল দান ॥
মানুষ ভগবান।

পিছন পানে তাকাবার অবসর নেই ওর। আত্মভোলা বাউল চলেছে এগিয়ে। পিছনে পিছনে চলছে কয়েকজন উৎসাহী মানুষ। কিন্তু হঠাৎ বিপর্যয় ঘটে গেলো একটা, কে এসে অকস্মাৎ ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করলো নবীনকে। কালোপাথরের কালো মাটি হয়ে গেল লাল। এই বৃত্তান্ত বলে খানিক চোখ বন্ধ করে কি ভাবলেন গোঁসাই। গোঁসাই-এর কাছে আরো কিছু শোনবার আশায় দাঁড়িয়ে থাকলো রাধা আর মালিনী।

—নবীনকে দেখতে যাবো কাল। শুনলাম হাসপাতালে আছে। রাধা মালিনীর কানে কানে বললো. আমরাও যাব দিদি, একবার দেখে আসব বাউলকে।

—তাই যাবি রাধা।

পাঁচ

যন্ত্রনার অনেকটা উপশম হয়েছে নবীনের। মাথার ব্যাণ্ডেজ এখনো বাঁধা আছে। কিন্তু ব্যথা আছে এখনো। জায়গাটা চিন্ চিন্ করে। সেদিন গোঁসাইজী এসেছিলেন দেখতে। পাশে বসে ক্ষতস্থানে, অতি সাবধানে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে অনেক কথা বলেছিলেন, তার মধ্যে একটি কথা মনে আছে নবীনের। গোঁসাইজী বলেছিলেন, আমি জানতাম, তোর মৃত্যু নেই নবীন। তুই মরণজয়ী।

—ওখানের দাঙ্গা মিটেছে গোঁসাইজী ? জিজ্ঞেস করেছিল নবীন।

—মিটবে বৈ কি। চিরদিন কি এই দাঙ্গা চলে রে, ও যে—একদিন মেটাতেই হবে।

রাধা ও মালিনী এসেছিল গোঁসাইজীর সঙ্গে। রাধা নবীনকে দেখে আপনার অশ্রুধারার পথ আটকে রাখতে পারেনি। মুখে কিছু প্রকাশ না করলেও মনে মনে যে কথা বলেছিল সে, তা বুঝতে পেরেছিল নবীন। রাধা চেয়েছিল নবীনের সেবা করতে, তাই হয়ত বলেছিল, হাসপাতালে আবার কেউ থাকতে পারে নাকি দিদি !

—যাদের মাথা ফাটে তারাই পারে রাধা। জবাব দিয়েছিল নবীন।

রাধা বলেছিল, এখন ত ভালো আছ, এখন—বলতে গিয়েই থেমে গিয়েছিল রাধা।

মালিনী বলেছিল, বলনা পোড়ারমুখী, যে—বাউল তুমি আশ্রমে চলো আমি তোমার সেবা করবো। সেবা করবার জন্য যে ছট-ফট করছিস তুই—তা আর বুঝতে লারি লো !

রাধা মাথাটা নামিয়ে দিয়েছিল লজ্জায়। সূর্যের রক্তিম আভা এসে আশ্রয় নিয়েছিল ওর সারা মুখে। সে কথা বলতে পারেনি।

ওর নীরবতাই ওকে ধরিয়ে দিয়েছিল নবীনের কাছে। নবীন আজ এই আসন্ন সন্ধ্যায় আপনার খাটিয়ায় বসে সেই রাধার কথাই ভাবছিল। ভুল করেছে রাধা। মন যদি সে দিয়েই থাকে নবীনকে, তবে ভুল করেছে বৈ কি! রাধাকে গ্রহণ ত সে করতে পারবে না কোনো দিন। কেন ? কারণ আছে বৈ কি। রাধা ওর গুরুর শিষ্য, এ ছাড়াও—।

মনে পড়তো ভৈরবীর কথা। ভৈরবীর অঙ্গ-গন্ধ এখনো নবীনের অঙ্গে লেগে রয়েছে। এখনো সে অনুভব করে ভৈরবীর সেই শ্লথ স্খলিত অঙ্গ স্পর্শন। জ্বালা ধরে গিয়েছিল নবীনের মনে, দুর্বলতা এসে আশ্রয় নিচ্ছিল তার মনে—তাই ত তাকে ভুলবার জন্যই নবীন চলে এসেছিল গোঁসাইজীর কাছে। ইচ্ছা ছিল—সব

কথা অকপটে গোঁসাইজীকে জানিয়ে একটা ক্ষমা প্রার্থনা করবে, কিন্তু তার আর অবসর হলো না।

—এই যে মহাপুরুষ!

হাসপাতালের জেনারেল ওয়ার্ডের কোণের দিকে একটা বিছানায় বসে অনেক কথাই ভাবছিল নবীন। তার কথা, রাধার কথা, ভৈরবীর কথা,—মনে মনে বিচার করে দেখছিল তার অতীত কাজ-কর্ম, খতিয়ান করছিল তার লাভ ক্ষতির। কি সে পেয়েছে, কি পায়নি। এমনি সময়েই অর্জ্জুন এসে উপস্থিত হলো।

—অর্জ্জুন! আনন্দে জড়িয়ে ধরলো নবীন।

—ই কি হুঁয়্যাছে? জিজ্ঞেস করলো অর্জ্জুন।

—এসেছ যখন তখন সবই শুনবে। কেমন করে জানলে আমি এখানে আছি? জিজ্ঞেস, করলো অর্জ্জুন। অর্জ্জুনকে বসালো নবীন তার খাটিয়ার এক পাশে।

পাণ্ডে বলে যে খালাসীটি অর্জ্জুনদের সঙ্গে কাজ করে, সে এসেছিল হাসপাতালে। রোড সাইড ষ্টেশনের নিকটেই এই হাসপাতাল, কাজেই ষ্টেশনের কর্মচারীদের অসুখ-বিসুখ হলে এখান থেকেই চিকিৎসিত হয়। পাণ্ডে এসেছিল তার ছেলের ওষুধ নিতে—আজ সাত দিন একজ্বরী অবস্থায় পড়ে আছে সে। সেই পাণ্ডে গিয়েই বলেছিল, ওহে জমাদার তোমাদের বাউলকে ফাট্টি বাঁধা পড়ে থাকতে দেখলাম হাঁসপাতালে।

—কে মার্‌য়্যাছে শুনি!

অর্জ্জুনের কথার সুরে বেশ বোঝা গেল, সে রেগে উঠেছে। নবীন সব কথাই বললো অর্জ্জুনকে। অর্জ্জুন শুনে খুশি হতে পারলো না। সে আরো রেগে গিয়ে বললো, তা তুমার সেই বুড়া গোঁসাইজীই ত থাকলে পারভেন, ঐ সব গুরুদের আমি খুব বুঝি—নিজের জীবনটাই জীবন, আর পরেরটা কিছু নয়।

—ছিঃ অমন কথা বলতে নাই।

—না বলতে নাই! তুমি আর ওই গুরুর আখড়ায় যাত্যা পাবে নাই।

অর্জ্জুনের কথা শুনে হাসলো নবীন।

—তুমি হাসছ ? ইদিকে তুমাকে যে লোকে হাসছে !

—কেন ?

—ক্যানে আবার কি, শুনবে সব।

—তুমি ত জান, তুমিই বল !

অর্জ্জুন বললো, না শুনলে আর মন-ট থিরাছে নাই, বেশ শুন, ওই ধম্মদাসের বিটি ভৈরবীর মাথা বিগড়ে গেইছে। দিন-রাত নাকি গুম্ হুঁয়্যা বসে থাকে, কাঁদে। কখনো কখনো গায়েন করে আপনার মনেই, উয়ার মা বলছে, তুমিই নাকি মাথা খারাপ কৈরে দিয়েছ। তিরলের লুহা পরাবেক বলে উয়াকে নিয়ে যাবেক। তুক্ তাক্ জান নাকি তুমি ?

শেষের কথাটা আর কানে গেলো না নবীনের। সে ত জ্ঞানত কোনো অশোভন আচরণ করেনি। নিজের দুর্বলতা পাছে নবীনের চলার পথে বাধা সৃষ্টি করে তারই জন্য সেদিন রাত্রে ভৈরবীকে ঘুম পাড়িয়ে চলে এসেছিল নবীন—নিজেকে ধরা দেয়নি নবীন। অতি সঙ্গোপনে নবীনের মন চেয়েছিল ভৈরবীকে, এ-কথা মিথ্যা নয়। কিন্তু সে কথা মনের তলেই মিলিয়ে গেছে, তাকে প্রকাশ হতে দেয়নি নবীন। তব কেন ভৈরবীর এই উন্মাদ অবস্থা! মন খারাপ হয়ে গেলো নবীনের। হয়ত ভৈরবীর এই অবস্থায় তাকে যন্ত্রনাও সইতে হচ্ছে। নির্যাতন চলছে তার উপর। ভৈরবী কাঁদছে, মুখ ফুটে বলতে পারছেনা কিছু।

—আমি গেলে কিছু কি উপকার হবে অর্জ্জুন ?

—হবেক বৈ কী। বারে, তারা তুমার নামে বদনাম রটাবেক অমনি।

—দুর্নামে আমার ক্ষতি নাই অর্জ্জুন।

—কিন্তু ওই বিটিটর ?

—বেশ আমি যাবো।

অর্জ্জুন নিয়ে এলো নবীনকে। আবার পরিত্যক্ত আখড়াটা পরিস্কার করতে হলো। বেড়াটা ভেঙ্গে নিয়ে গিয়েছে কারা, এই কিছু দিনের মধ্যেই আগাছায় ভরে গেছে উঠানটা। আখড়ার মেঝের

গোবর মাটি উঠে গেছে। স্থানে স্থানে গোময় পড়ে আছে খানিক। বেশ বোঝা গেলো ফাঁকা পেয়ে এখানে গোরু ঢুকে যথেচ্ছ বিচরণ করেছে। বাউল ফিরে এসেছে শুনে অনেকেই দেখতে এলো তাকে। কেউ থাকলো বাইরে দাঁড়িয়ে, কেউ এলো ভিতরে। কেউ হাসলো ওকে দেখে, কেউ জানালো সহানুভূতি। সব কাজ সারা হয়ে গেলে অর্জ্জুন বললো, আজ আর রাঁধতে হবেক নাই, আমি পাঠাঞ দিব বৌকে।

সবাই যখন চলে গেলো তখন রাত্রি হয়েছে। আখড়াটা ফাঁকা হয়ে গেলে একবার ইচ্ছা হয়েছিল, দেখে আসে ভৈরবীকে। কিন্তু শরীরটা বড়ো দুর্বল, হাটতে গেলে মাথা ঘুরোয়, কাজেই স্থির করলো—সেই দিনটায় বিশ্রাম নিয়ে এর পরের একটা দিন গিয়ে দেখে আসবে ভৈরবীকে, যদি প্রয়োজন হয় তবে—

—নবীন আছো ?

—কে ? জিজ্ঞেস করলো নবীন।

—আমি ধম্মদাস খুড়া।

—ধম্মদাস খুড়া ? আস্থন, আস্থন। নবীন উঠে গিয়ে ডেকে আনলো ধম্মদাসকে। বস্থন !

—না বসতে আসি নাই, বলতে আস্থাছি—এই সববনাশ ক্যানে করলি আমার ? ভৈরবী যে পাগল হঁয়্যা গেল। বলতে বলতে কেঁদে ফেললো ধর্মদাস।

নবীন উত্তেজিত না হয়ে শান্ত ভাবে বললো, আমি শুনেছি খুড়া—আর তারই জন্য হাসপাতাল থেকে পালিয়ে এসেছি। বলুন আমি কি করতে পারি। বলেন ত একবার দেখা করি ভৈরবীর সঙ্গে।

—না বাবা না, আর দেখা করে কাজ নাই। কি হৈতে আবার কি হঁয়ে যাবেক। ছিঃ ছিঃ ছিঃ—আমার যে ভাবতেও খারাপ লাগে, উয়ার পুরুষ আছে, সে চলে গেইছে, কিন্তুক আবার ত আসবেক—তা জানেও, তুই ভৈরবীর গায়ে হাত দিলি।

—দিতে বাধ্য হয়েছিলাম খুড়া।

রেগে উঠলো ধর্মদাস।

—বাধ্য হঁয়্যাছিলি, দোষটা এখন ভৈরবীর ঘাড়েই চাপাতে চাস নবীন? আমার বিটি তোকে ডাকতে গেইছিল মেলায়? অত লোকের মাঝে হিড় হিড় কৈরে টানে লিয়ে গেইছিলি পখোরের ধারে—আর বলছিস বাধ্য হঁয়্যাছিলি হাত দিতে, লাজ লাগছে নাই তোর?

কোনো কথা বললো না নবীন

ধর্মদাস বললো, তা যা হঁয়্যাছে, এখন গাঁ থাকে তুই চলে যা নবীন।

রাতটা কাটলো। সকাল হলো। সারাটা রাত চিন্তা করেছে নবীন, কি তার করা উচিত। এ গ্রামের মানুষকে সেবা করবার সঙ্কল্প নিয়েই সে এক দিন আখড়া খুলেছিল—কিন্তু সেবা সে কি করতে পেরেছে, তার পরিবর্তে একটা দুর্নাম, অপবাদ পেয়েছে—গ্রামের সবাই হয়ত আজ ওই কথাই ভাবছে—নবীন চরিত্রহীন, নবীন লম্পট। উঃ মাথাটা কেমন ঝিম্ ঝিম করছে যেন, শিরাগুলো দপ দপ করছে—সমস্ত শরীর কাঁপছে তার। ধর্মদাস এসে বলে গেছে, নবীনকে এ গ্রাম ছেড়ে যেতে হবে। কি করবে সে? একবার অর্জ্জুনের সঙ্গে পরামর্শ করা উচিত নয় কি? সেই ভালো। নবীন অর্জ্জুনের কাছে যাবার জন্য উঠতে যাবে এমনি সময় মথন এসে উপস্থিত হলো। ওর সঙ্গে একটা পাঁচ সাত বছরের ছেলে। প্যাঁকাটির মতন চেহারা, গাল দুটো ফুলো। শরীরে রক্ত আছে বলে মনে হয়না। মথন বললো, আগে দেখা করতে আসতে লার্যাছি বাউল। বস রে ফটিক, বস বাবা, দুটা কথা বলি বাউলের সঙ্গে। মথন ছেলেটিকে পাশে বসিয়ে নবীনের সামনেই বসল সে।

—ফটিকের অসুখ করেছিল নাকি মথন?

—অসুখ ত দেখিত কিছু হয় নাই, তবে ভিতরে ভিতরে যদি হঁয়্যাছে।

নবীন বললো, তাই যদি হয়, তবে ডাক্তার দেখাও।

মথন দুটি আঙুল দিয়ে টাকা বাজানোর ভঙ্গি ক'রে বললো, এথি পাব কুথায়? ডাক্তার দেখালে ত এথির খরচ আছে। থাক্ যে-কদিন বাঁচ্যা আছে।

—অবস্থা ত তোমার মন্দ নয় মথন।

—এক দিন ছিল নাই, কিন্তুক এখন মন্দ কি বলছ—খুব মন্দ। এইত ক্ষেতে চাষের কাজ আরম্ভ হঁয়্যাছে—যাদের জমি আছে তারা কেউ বসে নাই, আর আমি? একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস বেরিয়ে এলো মথনের বুক ঠেলে। সে দীর্ঘশ্বাস স্পর্শ করলো নবীনকে। মথন বললো, লিজের ব্যাটা-বিটি অত যত্ন করি নাই বাউল, যেমন করেছিলাম ওই জমিটকে, লিজে না খায়্যা সার দিয়েছি। —কি ছিল, চড়রা ডাঙ্গা, সেই ডাঙ্গাকে কে ক্ষেত করলেক? এই আমি—আজ দশ শাল চষছিলম, আর আজ আমার কাছ থাক্যা কাড়্যা লিলেক জমিট। বলতে বলতে গলা ধরে এলো মথনের। তার হাল গোরু সমেত টেনে নিয়ে যাচ্ছিল বিষ্টু মড়ল।

নবীন জিজ্ঞেস করলো, বিষ্টু মড়ল ও জমি চষতে দেয় নাই তুম্যাকে?

—না। বরং মামলা কৈর‍্যাছে—বীজ ভাঙ্গার মামলা। তুমি আস্যাছ শুনে তাই আস্যাছি—। একটি উপ্‌কার কৈরবে ভাই!

নবীন কি উপকার করবে মথনের! কি করতে পারে সে? বিষ্টু মড়ল নবীনের কথা শুনবেই বা কেন? তাই বললো, আমি কি করতে পারি মথন।

—বি, ডি, ও, সাহেবকে তুমি জমি দিয়েছ পাঠশালা কৈরতে—সাহেব তুমার কথা লিশ্চয় শুনবেক। একবার বলবে উয়াকে?

কি ভাবলো নবীন। তারপর বললো উঁয়ারা কি কথা রাখবেন?

—তুমি বল্লে রাখবেন বৈকী। তুমি উনার কথা রাখেছ!

—বেশ আমি বলব।

মথনের ছেলেটি আর সোজা হয়ে বসে থাকতে পারছিল না। সে চঞ্চল হয়ে উঠেছিল যাবার জন্য। লক্ষ্য করেছিল মথন। মথন একবার ছেলেটির দিকে তাকিয়ে বললো, যাছি দাঁড়া। চলি ভাই তবে!

—কুথায় যাবে আবার?

অর্জ্জুন এসে উপস্থিত হলো। একেবারে স্টেশন থেকে সোজা আসছে। পরনে এখনো নীল রঙের খাকির জামাটা। অর্জ্জুনকে দেখে, নবীন খুশি হলো। অর্জ্জুন পকেট থেকে একটা হরি দাদার দোকানের

বিড়ি বের করে নিজে ধরালো, নবীনকে একটা দিল ; তারপর বললো, একট সুখবর আছে বাউল।

—কি শুনি ? হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলো নবীন।

—বায়না ধরেছি বাউল। আগাম অর্দ্ধেক দিবেক।

—কোথায় ?

—ইষ্টিশনেই। মাস্টর বাবুরা রক্ষা কালীর পূজা করে এই সময়। টাকা খরচ করে—কলকাতার গায়েন আসে। তা ইবার আমি বললম্ টাকা দ্যান্ ভাল গায়েন শুনাই দিব ? বাবুরা বল্লেক, "বেশ, তুইত ত কিছু আদায় করেছিস, তা কর ব্যবস্থা কর।" তা বললম দাও টাকা। দিয়ে দিলেন—একেবারেই পঁচিশটা। হেই লাও। পকেট থেকে টাকাটা বের ক'রে নবীনের সামনে রেখে দিল অর্জ্জুন।

—টাকা ত দিলে, কিন্তু আমি যদি গাইতে না পারি ?

—না পারবে ক্যানে ? বলি, এমনি মন মরা হঁয়্যা বসে বসেই কাটাবে নাকি ? কে কি বলেছে তার তরে বসে বসে ভাববেই নাকি ? সে সব হবেক নাই ! গাইতে হবেক। এই টাকা রইল।

নবীনের মানসিক অবস্থা যে খারাপ তা জানত অর্জ্জুন। বিশেষ করে যে দিন থেকে নবীন এখানে এসেছে সেই দিন থেকেই নবীনের নামের সঙ্গে ভৈরবীর নাম জুড়ে দিয়ে অনেকেই অনেক রকম রটনা করে বেড়াচ্ছে, আর সেই সব রটনা নবীনের কানে এসে পৌঁছাতেই, নবীন বিমর্ষ হয়ে পড়ছে।

অর্জ্জুন উঠে পড়লো।

—দাঁড়াও অর্জ্জুন, আমরাও যাবো ! বললো নবীন।

—কুথায় যাবে ?

সব কথা বললো মথন। মথনের কথা শুনে রেগে উঠলো অর্জ্জুন।

মথন বললো, হাসলি যে ?

—তুর বুদ্ধি দেখে। হ্যাঁরে, সাহেবরা কি কখনো কথা রাখে নাকি ?

—নবীন পাঠশালের তরে জমি দিয়েছে, আর নবীনের একটা কথা থাকবেক নাই ? বি, ডি, ও সাহেব ত হাকিম, হাকিমে হুকুম কৈরলে লিশ্চয় জমিট ফিরে দিবেক বিষ্টু।

অর্জ্জুন হাসলো মথনের কথা শুনে।

মথন বললো, হাসলি যে ?

—সাহেব ত দেখিস নাই মথন, সাহেবদের তুই জানিস না। আমরা দেখছি রে, হরদম দেখছি। উয়ারা উপকার মনে রাখে না।

মথন অবাক হয়ে তাকালো অর্জ্জুনের দিকে। অর্জ্জুন বললো, তাও যা, একবার কঁয়্যা দেখ, তবে আমি বলি—মামলা হৈছে হোক, তুই চাষ কর মথন। জোর করে হাল চালা।

—তুমি কি বল বাউল ? জিজ্ঞেস করলো মথন।

—তা অর্জ্জুন কিছু খারাপ বলে নাই মথন। অর্জ্জুনের পরামর্শটি গ্রহণ করার মত তখন মানসিক অবস্থা ছিল না মথনের। তাছাড়া ও সব করলে একটা হাঙ্গামা বাড়বেই, তার চেয়ে প্রথম বি, ডি, ও সাহেবকে বলেই দেখা ভালো। এই অঞ্চলের উন্নতি যাতে হয়—যাতে চাষ বেশী হয় তার জন্য উনি আছেন। ওঁকে বলাই ভালো। মথন সঙ্গে নিয়ে গেলো নবীনকে।

ছয়

অর্জ্জুনের আজ আর কাজ নেই। সারাটা দিন মাঠে খেটেছে সে। সন্ধ্যায় খাবার খেয়ে বেরিয়ে পড়েছে। যাবার সময় অর্জ্জুনের স্ত্রী জিজ্ঞেস করেছে, আবার যাইছ কুথাকে ?

—কুথায় আবার, আখড়ায়।

—জলদি ফিরবে।

—সে আমার যখন খুশি ফিরব, তাতে তুর কি ?

—নাইবা গেলে !

—ক্যানে শুনি ?

—গাঁয়ে ঘরে ত সবাই ছিঃ ছিঃ করছে ওই বাউলের।

—করছে ত বয়েই গেইছে বাউলের।

—লোকে তুমারও ত দোষ দিবেক।

—তাহলে গালের মতন চড় পাবেক। আমি মথনও লই, আর নবীন বাউলও লই যে সয়ে যাব। কপাট দিয়ে দিস।

—ইয়ার মধ্যেই ত বলছে, তুমিই নাকি নিয়ে আস্যাছ বাউলকে।

—বেশ করেছি। যা যা ঘুমাগা যা।

হন্ হন্ করে অন্ধকার রাস্তা দিয়ে ইচ্ছা করেই ধর্মদাসের দরজার পাশ দিয়ে আসছিল অর্জ্জুন। এ ছাড়া আরো একটা পথ আছে—সে পথটাতেই এ-পাড়ার লোক যাওয়া আসা করে কিন্তু স্ত্রীর কথা শোনার পর কি মনে হলো, এই পথটাই ধরলো অর্জ্জুন। বোধহয় আপনার শৌর্য দেখাবার জন্যই তার এই দুঃসাহসিক যাত্রা।

আপনার মনেই হুস হুস্ করে আসছিল অর্জ্জুন। একটা জায়গাতে এসেই থমকে দাঁড়ালো, কে যেন বেরিয়ে এলো পাশের একটা ঘর থেকে। শরীরটা চাদরে ঢাকা, অন্ধকারে ঠিক চেনা যায় না।

অর্জ্জুন জিজ্ঞেস করলো, কে ?

কোনো জবাব দিল না মানুষটি। অর্জ্জুন জোরে জোরে কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে একেবারে মানুষটিকে নাগালের মধ্যে এনে জিজ্ঞেস করলো, কে হে ?

— আমি।

—কে মড়লবাবু ?

—হাঁরে। গায়ের চাদরটা খুলে, কাঁধের উপর রেখে বিষ্টু বললো।

—ভাগ্যিস্ রা কাড়লে মড়লবাবু, না হলে এখনি এক-ট অনর্থ হুঁয়্যা যায়। আমি ভাবলম চোর টোর হবেক। দেখুন ত, কি কাণ্ড। তা এই রেতে ইদিকে ? ধম্মদাসের বাড়ী গেইছিলে বুঝি ?

—সে সব খবরে তোর দরকার কি ? যেখানে যাচ্ছিস যা। রেগে গিয়ে বললো বিষ্টু মড়ল।

—তা সে পথ আর কে বন্ধ করবেক মড়লবাবু।

সেদিকে ত যাবোই, তবে বলছিলুম, তুমি ইপথে ক্যানে ? অনেকে বলে, ধম্মদাসের ঘরে নাকি আজকাল বড় ঘন ঘন যাওয়া আসা হয় তুমার ?

—কাজ থাকলে যেতেই হয়।

—তা ত হবেকই, সে ত সবাই যায়। গাঁয়ের মানুষগুলা যে কেমন, সেদিন ইষ্টিশনে বাবুদের কাছে, এই গাঁয়েরই কে যায়্যা গল্প কৈরেছে, ধম্মদাসের ঘরে বিষ্টু মড়ল টাকা ছড়াচ্ছে।

—কে শুনি? তুই নাম বল অর্জ্জুনা।

—আমি ত শুনলুম বাবুদের কাছে গো। বরং বাবুদিকে বললুম, তা টাকা দিবেক বৈকী, ধম্মদাসের জমি কিনে নিয়েছে মড়ল, টাকা দিবেক নাই! বাবুরা বললেন, না জমাদার তুমি জাননা। আমি বললুম, জানব নাই কি বাবু। আমি উ গাঁয়ের লোক। বাবুরা কইলেক, জমির টাকা অনেকদিন দিয়ে দিয়েছে মড়ল, এখন টাকা দিচ্ছে ধম্মদাসের বিটি-টর তরে।

—অর্জ্জুনা! ধমক দিয়ে উঠলো বিষ্টু মড়ল।

—একেবারে আমার উপরেই যে রাগে গেলে বাবু। বাবুরা যা বলেছিল, তাই বললুম। ই কী আমি বলছি নাকি যে আমার উপর রাগে গেলে?

বিষ্টু আর কোনো কথা না বলে চলে গেলো সোজা রাস্তা ধরে। অর্জ্জুন খানিকটা আনন্দ উপভোগ করলো, মনে মনে গালাগালি দিল বিষ্টুকে। শয়তান। ধর্মদাস আর তার বৌটাকে টাকা দিয়ে হাত করেছে বিষ্টু। মথনের কাছ থেকে জমিটা কেড়ে নিয়ে চষতে দিয়েছে ধর্মদাসকে। ধর্মদাস ওর কাছে অনুগৃহীত। মনের আনন্দেই অর্জ্জুন এসে উপস্থিত হলো আখড়ায়। আখড়ায় আজ বিশেষ আয়োজন করেছে অর্জ্জুনই। অনেকদিন গান-বাজনা হয়নি, আজ গানের আসরের আয়োজন করেছিল সে। কয়েক জনকে আসতেও বলেছিল। গানের আসরের জন্য দু চার টাকা খরচ হবে—সে খরচের টাকাটাও সংগ্রহ করেছিল অর্জ্জুন।

আখড়ায় এসে ঢুকতেই দেখলো আসর বসে গেছে। কয়েকজন এসেছে—মথনদের পাড়ার জন কয়েক, আগেই এসেছে। নবীন মধ্যিখানে একতারা নিয়ে, ওর পাশে আরো কয়েকজন। নবীনের দোয়ারী হয়ে গান গাইবে।

অর্জ্জুন আসতেই, একজন বলে উঠলো, জমাদারের গাঁটছড়া এতক্ষণে ছিঁড়ল নাকি ?

—সে বলিস না, মাগী কিছুতেই আসতে দিবেক না, বলে আজ—না থাক্। লে গায়েন হোক।

অর্জ্জুনের কথায় হেসে উঠলো সবাই। অন্য একজন বললো, তা ইস্ত্রীকেও লিয়ে আইলেই হত।

—ইয়ার পরে লিয়ে আসব। নাও হে বাউল, ধর।

নবীন গাইলো। সঙ্গে সঙ্গে গাইলো উপবিষ্ট মানুষগুলি। আবার নবীন গাইলো, আবার সেই সুর আর সেই কথা ধ্বনিত হলো লোকগুলির মুখে। জমে উঠলো আসর। এমনি সময়েই থানা থেকে একজন এসে বললো, দারোগা সাহেব বোলায়েছেন নবীনকে।

নবীন বললো, কেন ?

সিপাহী উত্তর দিলো, বোলিয়েছেন কেনো, হামি জানিনা। চলো। পরস্পর পরস্পারের দিকে তাকালো। নবীন বললো,তোমরা বস, আমি শুনে আসি। চলে গেলো নবীন।

ফিরে এলো ঘণ্টাখানেকের মধ্যে। তখন অনেকেই চলে গিয়েছিল। যায়নি শুধু অর্জ্জুন আর মথন।

অর্জ্জুন জিজ্ঞেস করলো, কি বলছিল দারোগা।

—বলছিল, এ-গ্রাম থেকে আমি চলে না গেলে এ গ্রামের উন্নতি নেই। আমি নাকি তোমাদের উত্তেজিত করি, আমি নাকি—না থাক্। চিন্তিত দেখালো নবীনকে।

অর্জ্জুন বললো, বুঝেছি, এ ব্যাটা মড়লের কাজ। দেখলাম সোজা পথে সে গেলো থানার দিকে। তা যাই হোক—যাওয়া তুমার চলবেক নাই বাউল। তুমি কি বললে দারোগাকে ?

—বলেছি, আমি থাকাতে যদি অমঙ্গল হয়, তবে আমি চলেই যাবো বাবু।

মহা উত্তেজিত হয়ে উঠলো অর্জ্জুন। সে মাটিতে থাপ্পড় দিয়ে বললো, ক্যানে কইলে ই-কথা। না, তুমি যাবে নাই। যাওয়া তোমার হবেক নাই। আমি বলে দিয়ে আসি দারোগাকে।

সে উঠে পড়লো।

নবীন ডাকলো তাকে। সে শুনলো না। চলে গেলো গজ গজ করে।

উঠে পড়লো মথনও।

নবীন ডাকলো, মথন!

মথন ফিরে দাঁড়ালো।

নবীন উঠে গেল ঘরের মধ্যে, তারপর বেরিয়ে এসে মথনের হাতে দশটা টাকা দিয়ে বললো, ছেলেটার ওষুধ কিনে দিও।

মথন কিছু না বলে তাকিয়ে থাকলো নবীনের দিকে।

সুস্থতার পরিবর্তে অসুস্থতা বাড়লো নবীনের। সে যেমন বসেছিল তেমনি বসেই থাকল। উঠে নিজের রান্না করার প্রয়োজন বোধ করলো না। ঘরটা অপরিষ্কার হয়ে আছে, পরিষ্কার করার তাগিদ অনুভব করলো না। সেই যেদিন ফিরে এসেছে, সেই দিন ঝাঁটা পড়েছে, তারপর থেকে ময়লা জমে জমে স্থানে স্থানে স্তূপীকৃত হয়ে আছে। থাক্, কি হবে পরিষ্কার করে! ছেড়েই যখন যেতে হবে—তখন আর ঘর দুয়ারের পবিত্রতা নিয়ে কি প্রয়োজন! কিন্তু যাবার আগে যদি একটি বার ভৈরবীর সঙ্গে দেখা হতো, তাহলে যাবার সময় অন্তত বলে যেতে পারত, —যদি সত্যিই তারই অপরাধের জন্য তার মানসিক অবস্থার বিপর্যয় ঘটেছে, তবে যেন তাকে ক্ষমা করে ভৈরবী।

বাইরে অন্ধকার, আকাশের গায়ে কালো কালো মেঘ ছুটছে। এক স্থানে মিলিত হয়ে জমে যাবে ওরা, তারপর হয়ত বর্ষণ শুরু হবে। একটা ঠাণ্ডা হাওয়া নদীর ওপার থেকে বয়ে আসছে। নবীনের অবসাদ-গ্রস্থ দেহটার উপর একটু খানি শীতল পরশ বুলিয়ে দিয়ে মায়ের মত স্নেহ দিয়ে নবীনকে ঘুম পাড়িয়ে দিতে চাইছে যেন। সত্যই চোখ দুটি বুঁজে আসছে নবীনের।

—কিষ্ট ঠাকুর গো!

চমকে উঠলো নবীন। এ কার কণ্ঠস্বর! তাকিয়ে দেখলো—অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না। ভাবলো মনের ভ্রম। আবার চোখ বন্ধ করলো নবীন।

—ও কিষ্ট ঠাকুর!

এবার যেন অতি কাছ থেকে ডাকছে কোনো পরিচিতা।

উঠে বসলো নবীন। বল্লো, কে?

—আমি গো আমি, বাবারে বাবা, কি অন্ধকার!

স্বপ্ন দেখছে না ত নবীন! কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছে না সে।

—ভৈরবী?

—হঁা গো, চিনতে লারছ? চিনবে কি কৈরে?

—দাঁড়াও আলো জ্বালি।

বাধা দিল ভৈরবী।—না এই বেশ। কেউ কাকে ভাল করে দেখতে পাছি নাই—এই বেশ।

—এই এত রাতে তুমি চলে এলে যে!

—পালাঞ আইলুম। রইতে পারলুম কই—সেই গেইছ, আর ত দেখি নাই, তাই দেখতে আইলুম।

কাজটা ভালো করে নি ভৈরবী। এখুনি জানাজানি হয়ে গেলে সত্যিই একটা কেলেঙ্কারী ঘটবে।

—এখন ফিরে যাও ভৈরবী। এই রাতে তুমি এলে কেন?

—না আইলে কি উপায় ছিল?

—চল তোমাকে দিয়ে আসি।

ভৈরবী হাসলো। অন্ধকার রাত্রে এই প্রান্তরের এক প্রান্তে ভৈরবীর হাসি শুনে চমকে উঠলো নবীন!—হাসালে কিষ্ট ঠাকুর, তুমি হাসালে।

—কেন?

—একা এই আঁধার রাতে যখন আসতে পার্যাছি, যখন কি একা যাত্যা লারব? ঠিক পারব।

—তাহলে তাই যাও।

বিরক্তি মেশানো স্বর বেরিয়ে এলো নবীনের কণ্ঠ থেকে।

—বদনামের ভয় করছ নাকি কিষ্ট ঠাকুর? কিন্তু তার কি বাকী আছে? সবাই কি বলে কান পাত্যা শুনেছ?

ভয় পেয়ে গেলো নবীন। অন্যে কি বলে তা জানে নবীন, কিন্তু অন্যের কথা কি ভৈরবীরও কথা! সেও কি বিশ্বাস করে যে নবীন

ভৈরবীর দেহকে উপভোগ করতে চেয়েছিল। সেও কি বিশ্বাস করে নবীনের স্পর্শে ভৈরবীর দেহ অপবিত্র হ'য়ে গেছে!

—তুমিও কি— আর বলতে পারলো না নবীন। কে যেন তার গলা চেপে ধরলো।

—আমি বিশ্বাস না করলেও কিছু আসে যায় না। আমাকে যন্তনা ত সমানই ভুগতে হৈছে। শুনলুম তুমি নাকি গাঁ ছাড়্যা চলে যাবে?

—তাই ঠিক কর্যাছি।

—সেই ভালো, আমিও তবে বাঁচি। চল, তাই চল।

শিউরে উঠলো নবীন। একী বলছে ভৈরবী।

—আমার সঙ্গে তুমি কোথায় যাবে? ছিঃ এ-কথা তোমার মনে করাও পাপ। তোমার স্বামী আছে।

—পাপ পুণ্যি জানি না। আমাদের সমাজে সাঙা করা চলে, আর তুমাদের ত সমাজই নাই।

—আমি বাউল, সংসার করা আমার চলে না ভৈরবী।

এবার বুঝি সহ্যের সকল বাঁধ ভেঙে যায় ভৈরবীর। আর সইতে পারছে না কিছুতেই, সে অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে। গর্জে উঠে বললো, যদি সংসার করতে নাই, তবে অমন কৈরে আকড়ে ধরেছিলে কেনে? আমি মাতাল হঁয়্যা ছিলুম, আমি কিছু বুঝতে লার্যাছি, সেই সময় ভৈরবীর এই দেহ-ট বড় লরম মনে হঁয়্যাছিল, লয়?

—ভৈরবী!

—কি?

—এ সব মিথ্যা, বানানো। যদি অসাবধানে কিছু হ'য়ে থাকে তবে তুমি আমাকে ক্ষমা কর।

—ক্ষমা করলেও কলংক ত ঘুচবেক নাই, সবাই আমার দিকে আঙুল দিয়ে দেখায়ে বলবেক, উ বেবুশ্যা, বিষ্টু মড়ল জলের মত টাকা ছড়াছে, মা-বাপকে হাত করেছে, কিন্তু কেন সে ত আমি বুঝি,—না-না কিষ্ট ঠাকুর, আমাকে তুমি বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও!

অতি আবেগে আর উত্তেজনায় নবীনের হাত তুটি জড়িয়ে ধরলো ভৈরবী।

ভৈরবী ফুপে ফুপে কাঁদছে !

আকাশে মেঘ জমেছিল, সেই জমাট মেঘের একটা জায়গায় ফাটল দেখা গেলো। সার্কাসের রিং মাস্টারের হাতের চাবুকের মত এঁকে বেঁকে বিদ্যুৎ খেলে গেলো। বাইরের পৃথিবী অত্যন্ত নিস্তব্ধ। একটা পাতা নড়ছে না। একটা রাত-চোরা পাখী ডাকছে না, আর থাকতে পারলো না নবীন। ভৈরবীর উত্তপ্ত হাত দুটি আপনার মুঠির মধ্যে নিয়ে বললো, তুমি আমাকে একটা দিন সময় দাও ভৈরবী। শুধু এই রাত্রিটা। আজ ফিরে যাও।

—বেশ !

কাঁদছিল ভৈরবী। ওর অন্তরের বেদনা অশ্রু হয়ে ঝরে পড়ছিল দু চোখের কোণ দিয়ে। চুলের খোঁপা খুলে গিয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল চারিদিকে।

উঠে দাঁড়ালো ভৈরবী। গ্রাম সীমানা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গেলো নবীন।

সাত

কোনো বাধা মানে নি ভৈরবী, কারো মানা শোনেনি। সমাজের কাছে মুখ উঁচু করেই জানিয়েছিল, আমার যেখানে খুশি যাবো। কিসের থাকব। পড়ে পড়ে মার খাব নাকি ?

হয়ত এ-কথা বলত না, আর এমনি করে সকলের সামনে দিয়ে বেরিয়ে আসত না, যদি তাকে সেদিন রাতে নবীনের কাছে যাওয়ার জন্য মার না খেতে হতো। ধর্মদাস, অত বড়ো মেয়ের গায়ে হাত তুলেছিল সেদিন অসহ্য মনে হয়েছিল ভৈরবীর। ও বুঝেছিল এবারে যত দিন এই ঘরে থাকবে, তার জন্য তোলা থাকবে নির্যাতন।

নবীন ফিরিয়ে দিতে পারেনি আর। সে মনে মনে যুক্তি স্থির করেছিল—এ পথে সকলেরই আসার অধিকার আছে। কেউ যদি এই বাউলের ধর্ম গ্রহণ করে তার জীবনকে অতিবাহিত করতে চায় তাহলে বাধা দেবার অধিকার কারো নেই, নবীনেরও নয়।

নবীন গ্রহণ করেছিল ভৈরবীকে, কিন্তু গ্রামের লোকেরা নবীনের এই কাজকে সমর্থন জানাতে পারেনি, কিছুদিন এই ব্যাপার নিয়ে

আলোচনা চললো, দারোগাকে দিয়ে বিষ্টু মড়ল একবার চেষ্টা করেছিল ভৈরবীকে ফিরিয়ে আনার জন্য, কিন্তু কোনো ফল হয়নি। ভৈরবী বলেছিল, আমি নিজের ইছায় আস্যাছি।

এর পর আর কোনো প্রচেষ্টা দারোগা বাবুর তরফ থেকে করা হয়নি। বরং দারোগা বাবু বিষ্টুকে বলেছিলেন, ভৈরবী সাবালিকা, ওর মতামত আছে, কোর্টে গিয়ে হাকিমের কাছে যদি ওই কথা বলে, তবে ফল কিছুই হবে না।

এর পর স্বাভাবিক হয়ে এসেছিল অবস্থা, ঠিক এমনি সময়েই গোঁসাইজীর আখড়া থেকে সংবাদ এসেছিল গোঁসাইজীর অন্তিম সময়। শিষ্যদের দেখতে চেয়েছেন।

নবীনকে চলে আসতে হয়েছিল। ভৈরবীও এসেছিল ওর সঙ্গে।

এর পর বেশ কিছু দিন কেটে গেছে। গোঁসাইজী আর সে যাত্রায় বাঁচেন নি। শিষ্যদের মধ্যে নবীনকেই আশ্রমের ভার অর্পণ করে গেছেন। আশ্রমে রাধা ও মালিনী আছে। খেঁদা নাকি বিয়ে করে সংসারী হ'য়েছে। মালিনীর বয়স হয়েছে। চুলে পাক ধরেছে, গায়ের চামড়া লোল হয়েছে। চুলে পাক ধরলেও—মনে পাক ধরেনি মালিনীর, তেমনি পরিহাস প্রিয়া, তেমনি হাসি-তামাসাতেই দিন কাটিয়ে দিতে চায়। বলে, ক্যানে হাসব নাই লো। কে ক' দিনকে আস্যাছে, চোখ মুজলেই (বুজলেই) ত সব শেষ।

সে নবীনকে এক দিন বললো, ই বেশ হৈল ছোট গুঁসাই। রাধা ছিল, চন্দ্রাবলী ছিল নাই,—সেই চন্দ্রাবলী আইলো! দেখিস লো রাধা, আবার দু সতীনে ঝগড়া করিস না।

রাধা লজ্জায় মরে যেত, কোনো জবাব দিত না।

—কি লো আবার মান করলি নাকি?

—তুমি ত বিন্দা আছ, মান ভাঙ্গাবে!

—তাই হবেক, আসুক ছোট গুঁসাই।

নবীন সকাল হলে বেরিয়ে যেত। এ অঞ্চল তার পরিচিত, বহুবার এ অঞ্চলে ঘোরা ফেরা করেছে নবীন, এই ত সেবার ওই কালোপাথরে মার খেয়েছিল, মাথাটা ফেটে গিয়েছিল, এখনো দাগ আছে। সে দিকেও

যায়। পরিচিত অনেকের সঙ্গে দেখা হয়। এখানে সবাই ওকে নতুন বাবাজী বলেই ডাকে। গেলে আর ছাড়তে চায় না তাকে। থাকতে হয় ওদের কাছে। গান শোনায় ওদের। ওরা বেশী বলে ওদের চাকরির কথা। সাত আটশ ফিট নীচে কেমন করে কয়লা কাটে, কেমন ভাবে টব গাড়ী ভর্তি করে—এই সব। শুনে আশ্চর্য লাগে তার। মাটির তলে দম বন্ধ হয়ে মারা যাওয়াই ত স্বাভাবিক।

নবীন বলে, যদি উপর থেকে মাটি ধ্বসে পড়ে!

একজন ছোকরা বয়সী মানুষ বলে, পড়ে না নাকি? এই ত ক-দিন আগে ছটা মালকাটা মরে গেল।

—তাহলে বল জীবনকে হাতে নিয়ে কাজ করতে হয়।

—তা বৈকী। কে যে কখন মরব, তার কি ঠিক আছে! এই কাজ করছি, তখন হয়ত মাথার উপর একটা চাংড়া পড়ে গেল, কিম্বা আলো নিভে গেল, নয়ত হু হু করে জল ঢুকে গেলো খাদে।

অবাক হয়ে শুনে নবীন। ওদের কথা শুনতে শুনতে বেলা বেড়ে যায়, ওদের মধ্যেই কেউ তখন হয় বাড়ীতে নয় রাস্তাব ,ধারের মিষ্টির দোকানে নিয়ে গিয়ে কিছু খাইয়ে দেয়। ফিরে যখন, তখন রাত্রি হয়ে যায়। এ-ঘটনা প্রাত্যহিক। এই প্রাত্যহিক ঘটনার মাধ্যমেই একটা আত্মীয়তা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।

একদিন মালিনী অনুযোগ করে বললো, না বাপু, তুমার সংসার আগলে থাকতে আমি লারব।

—কেন? জিজ্ঞেস করলো নবীন।

—হাঁ, সকাল সকাল ফিরো এখন থাক্যা।

—কেন, কি হ'লো?

—কি আবার হবেক, যা হয়—একজন কাঁদে, একজন মন-মরা হয়ে বসে থাকে।

নবীন হেসে উঠলো কথা শুনে। তা যদি থাকেই তবে কি করা যায়।

ভৈরবী এসে প্রতিবাদ করে বললো, হুঁ তা বৈকী, কাঁদতে বয়েই গেইছে।

—বেশ দেখব আজ সন্ধ্যায়।

সন্ধ্যায় গানের আসর বসত। সে আসরে ভৈরবীও আসত, কিন্তু গাইত না সে, একদিকে বসে গান শুনত। মালিনী বহুবার তাকে বলেছে, এই আখড়ার নিয়ম, সবাইকেই গাইতে হয়। তোকেও গাইতে হবেক চন্দ্রাবলী। ভৈরবী বলেছিল, গান গাইতে আমি জানি না। গাইব কেমন কৈরে। মালিনী বলেছিল, জানি লো জানি—কে যে কত গুণী, তা জানি। গান তোকে গাওয়াবই আমি। আজ সন্ধ্যায় যদি গান না করিস তবে জানব আমার কথা মিছা।

—তাই দেখবে।

শরৎ শেষ হয়ে গিয়ে হেমন্তের হাওয়া বইতে স্থরু করেছে। বাতাসের সঙ্গে ভেসে আসছে পাকা ধানের গন্ধ। জমি থেকে রস টেনে নিয়ে সোনালী ধান ফলেছে। আখড়া থেকে বাইরে পা দিলেই চোখে পড়ে কাঁচা সোনায় ঢাকা ক্ষেত। ভৈরবী তাকিয়ে থাকে সেই দিকে। এ-সময়টায় ওর বাপ থাকত ক্ষেতে—ধান যাতে চুরি করে নিয়ে যেতে না পারে, পাহারা দিত ধর্মদাস। ঘরের উঠানেই খামার হতো,—উঠানটিকে ঝক্‌ঝকে করে নিকিয়ে রাখত ভৈরবী। ধান কাটা হলে মাথায় করে ধানের বোঝা নিয়ে আসত বাপ-বেটিতে।

আগেকার কথা ভাবতে গিয়ে মনটা কেমন রি রি ক'রে উঠলো ভৈরবীর। মাথাটা একবার তীব্রভাবে আন্দোলন ক'রে ভাবনাটাকে ঝেড়ে ফেলবার চেষ্টা করলো সে। যে জীবনকে নিজের ইচ্ছায় ফেলে এসেছে, তাকে আবার মনে করা কেন ?

—কি লো চন্দ্রাবলী, বলি রাস্তার ধারে দাঁড়াই ক্যানে? মনের মানুষ ত ঘরেই আছে। মালিনী বাইরে ভৈরবীকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে পরিহাস করবার লোভটুকু সামলে রাখতে পারলো না।

—সে ত ঘরেরই মানুষ গো দিদি, সে আর যাবেক কুথায় ? হাসতে হাসতে জবাব দিল ভৈরবী।

—ঘরের মানুষকে নিয়ে মন ভরে নাকি লো, তাই—

—তা ক্যানে, দেখছিলুম অমন যোড়াটি আছে কি-না।

—নাই লো নাই, অমন আর একটি পাবি নাই। ভালো বাসেছিস, কাঁদবি। রাধাও কাঁদে।

মালিনী আর কিছু না বলে চলে গেলো ভিতরে। ভৈরবীও চলে গেলো আশ্রমের পিছনে।

এখানে আসার পর কেমন যেন নিঃসঙ্গ মনে হতো আপনাকে। বাঁধা-ধরা নিয়ম করা কাজ-কারবার, চলাফেরা, সঙ্গোপনে বসে রসকলি টানা—গুণ গুণ করে গান গাওয়া, এ-সব ভালো লাগত না ভৈরবীর।

একদিন মালিনী জোর করে ওকে বৈষ্ণবী সাজিয়ে দিয়েছিল, ছিঃ মা—কি দেখাচ্ছিল তাকে, নাক থেকে সিঁথি পর্যন্ত রসকলি, কাঁধের উপর একটা ভিক্ষার ঝুলি—হাতে খঞ্জনি, কি বিশ্রীই দেখাচ্ছিল। সে টেনে ফেলে দিয়েছিল সে বেশ। মুখ টিপে হেসেছিল রাধা।

মালিনী বলেছিল, এই যে জীবন ভর কৈরতে হবেক লো। আজ ফেলে দিলে কি হবেক।

—আমি দিদি ভিখ্ কৈরতে লারব। তার থেকে চাষ কৈরব।

চাষ! হেসে উঠেছিল মালিনী আর রাধা। রাধা বলেছিল, সেই ভালো দিদি—তাই কৈরবে তুমি। আমাদের ত ই-ছাড়া গতি নাই!

তাই করেছিল ভৈরবী! আশ্রমের পিছনে অনেকখানি জায়গা এমনি পড়ে থাকত। জায়গাটা দেখে লোভ হয়েছিল তার। মাটি চেনে ভৈরবী, এ-মাটিতে যা দিবে তাই হবে। মাঠে মাঠে গিয়ে গোবর এনে ছড়িয়ে দিয়েছিল ফাঁকা জায়গাটায়, তারপর নিজেই কোদাল চালিয়ে সব্জী দেবার মত খানিকটা জায়গা তৈরী করে—লাগিয়েছিল, বিলাতি বেগুন, কুমড়ো। সারাটা দিন সেই বাগানেই থাকত ভৈরবী। কোন গাছের কেমন বাড় হচ্ছে দেখত, কোন গাছে ফুল আসছে, কোন গাছের ফুল ঝরে গিয়ে ফল ধরতে শুরু করেছে তার হিসাব মুখে মুখে ভৈরবীর। সন্ধ্যা হলে এসে বসত গানের আসরে। অনেকেই আসত। জম-জমাট ভাব। কাছা-কাছি গাঁয়ের মানুষরাও আসত কেউ কেউ লণ্ঠন নিয়ে। চলত গান গল্প।

কয়েকটা বেগুন গাছ কেমন যেন মুষড়ে পড়েছে। বড়ো বড়ো প্রশস্ত পাতাগুলো কেমন যেন কুঁকড়ে যাচ্ছে—, শিকড়ের নীচে হয়ত

লেগেছে পাথর, এ সময় পাথর উঠিয়ে দিতে গেলে হয়ত গাছগুলিই মরে যাবে, এই আশংকায় গাছগুলি যেমন ছিল তেমনি রেখে দিয়ে গাছের চারি ধারের মাটিটা টেনে গাছের মূলে জমা করে দিল ভৈরবী। ও পাশের বিলাতি গাছটা বেশ ডাল মেলেছে—হলদে হলদে ফুল ধরেছে কয়েকটা। অতি স্নেহে গাছটাকে জড়িয়ে ধরে তার আঘ্রাণ নিলো ভৈরবী। আঃ বড়ো মিষ্টি গন্ধ!

—কি লো চন্দ্রাবলী, বলি, আজ কি খাবার কথাও ভুলে গেইছিস নাকি? মালিনী এসে বললো।

—তুমাদের সব খাওয়া হঁয়্যা গেল নাকি দিদি!

—তোর জ্বালায় কি হবার উপায় আছে! কি করছিস কি?

—আমার বিলাতি গাছে ফুল ফুটেছে দিদি!

—ইবারে তবে গাছট-র পরমায়ু শেষ হুয়্যা আস্যাছে। আয়। ফুল ফোটা মানেই দুঃখ পাওয়া,—বুঝলি মুখপুড়ী!

—ইয়ার পরে ফল ধরবেক দিদি।

—ধরলে ভালোই; কিন্তু লক্ষ্মণ ত কিছু দেখছি নাই লো। ফুল হলেই কি ফল হয়? অনেক ফুল ঝরে যায়, তা জানিস। চল খাবি।

—ই ফুল ঝরবেক নাই দিদি; ফল নিয়েই ফুল আস্যাছে।

—দেখতেই আছি।

আজ নবীন আর বাইরে যায়নি। যাবার প্রয়োজন হয়নি। কালো-পাথর থেকে দু জন এসেছিল নবীনের আখড়ায়। ওদের এক দিন আসতে বলেছিল নবীন। তাদের নিয়েই বসেছিল সে। বাইরে একটা চ্যাটাই বিছিয়ে দিয়ে তারই উপর বসে কথা-বার্তা হচ্ছিল।

গোবর্দ্ধন বললো, তোমার গান বড়ো ভালো লাগে বাউল, তাই শুনতে এলাম।

—বেশ, এ ত আমার সৌভাগ্য। শুনাব—নিশ্চয় শুনাবো।

এই মানুষগুলিকে বড়ো ভালো লাগে তার। অদ্ভুত মানুষ এরা, যেন একটা ভিন্ন জাত, ভিন্ন গোত্র। বে-পরোয়া জীবন, সহজে জ্বলে

না ; কিন্তু যখন জ্বলে উঠে তখন আর নিবতে জানেনা। সব থেকে ভালো লাগে এদের আত্মীয়তা।

—এক দিন দল-বল নিয়ে আমাদের ওখানে চল বাউল। আমাদের মিটিং হবে, তুমি গাইবে। বললো গোবর্দ্ধন।

—যাব। উত্তর দিল নবীন।

গোবর্দ্ধনের সঙ্গে আরো এক জন এসেছিল, গোবর্দ্ধন পরিচয় করিয়ে দিল তার। নাম অজয়। ওদের ইউনিয়নের সেক্রেটারি। এই কলিয়ারীতেই কাজ করত সে, একবার বছর দুই আগে কলিয়ারীতে মাল-কাটাদের মজুরী নিয়ে আন্দোলন হবার সময় অজয়ের চাকরিটা চলে যায়। সেই থেকে বেকার ও। মজুরদের আপনার লোক বলেই তারা ওকে সেক্রেটারি ক'রে রেখেছে।

—এই অজয় বাবু পুরা একটি বছর জেল খেটে এসেছে, বললো গোবর্দ্ধন।

নবীন শুনে অবাক হলো। ভালো করে তাকিয়ে দেখলো অজয়কে। হাসতে হাসতে বললো, তাহলে আপনি ত কঠিন লোক বাবু! জেলে নাকি হাতে পায়ে কড়া দিয়ে রাখে, ঘানি টানায়—এ সকল করতে হয়েছে নাকি আপনাকে।

—তা জেলে গেলে করতে হবে বৈকী। হাসতে হাসতে বললো অজয়।

—পিঠটা খুলে দেখাও না অজয় দা! বললো গোবর্দ্ধন।

—থাক্ থাক্ আর দেখাতে হবে না। আমি ভাবছি আপনি ত ভালো কাজই কচ্ছিলেন, তবু জেল হল কেন।

—সে অন্য দিন বলবো। বললো অজয়।

শুনবার জন্য, জানবার জন্য কেমন কৌতূহল হলো নবীনের। সে বললো, আজ ত এখনো বেলা রয়েছে বাবু।

—বলেই দাও না অজয়দা। বললো গোবর্দ্ধন।

অজয় বললো, মানুষকে ভালোবাসতে গেলে মার খেতে হয়। চৈতন্যদেবও ত খেয়েছিলেন। আজ উঠি।

উঠে পড়লো অজয় আর গোবর্দ্ধন, যাবার সময় আবার বলে গেলো

ওদের মিটিংএর দিন উপস্থিত থাকতে। দিন এবং সময়ও জানিয়ে দেবে পরে।

ওরা চলে গেলেও—অজয়ের কথাটি কেমন যেন তার মনে গাঁথা হ'য়ে রইলো। বড়ো সত্য কথা বলেছে বাবুটি, মানুষকে ভালোবাসতে গেলে মার খেতে হয়। চৈতন্যদেবও ত খেয়েছেন। হাঁ খেয়েছেন বৈকী —রক্ত ঝরে পড়েছিল, তবু ত উপকার করে গেছেন মানুষের।

রাত্রে নবীন আপনার ছোট্ট কুঠুরিতে শুয়ে শুয়ে ভাবছিল, এই নিয়ে গান রচনা করার কথা। অজয়ের বিষয়ে যতটুকু শুনতে পেলো, তাতেই বুঝলো—মানুষটি ওই কলিয়ারীর মানুষগুলির উপকারের জন্য নিজের জীবনকে বিলিয়ে দিয়েছে। অজয়কে নিয়েই গান লিখবে নবীন।

ছোট্ট প্রদীপটা টেনে আনলো সামনে—

ভৈরবী চুপি চুপি এসে বললো, কিষ্ট ঠাকুর!

নবীন মুখ তুলে তাকালো।

ভৈরবী আজ সেজেছে। গৈরিক বসন ওর ভালো লাগেনা—কেমন যেন ভিখিরি ভিখিরি পোষাক—তার চেয়ে সবুজ রংটা ভালো। ফিকে সবুজ—ওর মধ্যে যেন একটা রস পাওয়া যায়। সব থেকে ভালো লাগে বাসন্তী রং। প্রাণের আকাংখার সঙ্গে ও যে একেবারে খাপ খেয়ে যায়। মনে আনন্দ সঞ্চার করে। শাড়ীটাকে বাসন্তী রঙে রাঙিয়েছে ভৈরবী। তাই পাক দিয়ে পরেছে। কোনো দিনই গায়ে কিছু পরেনি ভৈরবী। ব্লাউজ, বডি, পরলেই যেন রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে আসে—, খালি গায়ে থাকতে ভালোবাসে ভৈরবী। এই খালি গায়ে থাকার জন্য মালিনীর কাছে কথা শুনতে হয়েছে ভৈরবীকে—'ওলো, বয়সটর দিকে চাইবি। এক জনকে ত রূপে ভুলাইছিস আবার কেউ যদি—

ভৈরবী হাসতে হাসতেই বলেছিল, তা যদি কেউ মরতে চায়, মরবেক।

—আ মর, কথার ছিরি কি! আমি এক-ট জামা আইন্যা দিব, তাই গায়ে দিস।

জামা এনে দিয়েছে মালিনী, কিন্তু ভৈরবী সেটা গায়ে দেয়নি, যেমন

এনে দিয়েছিল তেমনি আছে। অসাবধানে তাকালেও বুকের অনেক খানা অংশ নজরে পড়ে ভৈরবীর।

আজ আবার যত্ন ক'রে রসকলি টেনেছে ভৈরবী। সাজি মাটি দিয়ে মাথা ঘষেছে। রুক্ষ চুলগুলো ফেঁপে ফুলে আছে। গলায় সাধ করেই নিয়েছে একটা ফুলের মালা।

—তোমাকে মানিয়েছে ভৈরবী।

—তাও ভালো যে তুমি দেখতে পাইলে।

এর কোনো জবাব দেওয়া প্রয়োজন মনে করলো না নবীন। সে মুখ নামিয়ে থাকলো।

মুচকি হাসলো ভৈরবী।

—বলি শুনেছ ?

—কি ?

হেসে উঠলো ভৈরবী। চমকে উঠলো নবীন। একি অস্বাভাবিক হাসি হাসতে সুরু করেছে ভৈরবী!

—হাসছ কেন ? জিজ্ঞেস করলো নবীন।

—কি কৈরব, হাসি লাগে যে! দিদি বলছিল,—হি-হি-হি—, বলছিল ইবারে নাকি আমার কপাল ভাঙলো।

—কেন ?

—বসব তোমার বিছানায় ? জিজ্ঞেস করলো ভৈরবী।

—বস।

—ওই যে গো কারা আস্যাছিল ;—উয়ারা নাকি সুবিধার লোক লয়। উয়ারা হাঙ্গামা করে, লুঠ-পাঠ মার ধর করে, পুলিশ দারোগা ভয় পায়। সব জেল-খাটা, দাগী লোক।

—তাতে আমাদের ডর কিসের ?

—উয়ারা নাকি যার দিকে চায়, তাকেই লিজের দিকে টানে লেয়—

—তাই আবার হয় নাকি ?

—হয়, দিদি সব জানে, কলিয়ারীর মালকাটা দিকে বশ কৈরেছে। তোমাকেও বশ করে ফেলবেক।

ভৈরবী একটু সরে বসলো। নবীন গন্ধ পাচ্ছে ওর অঙ্গের।

—আর যদি তোমার দিকে তাকায়, তাহলে তুমিও ত বশীভূত হবে। বেশ, এবার তোমার দিকে তাকাতেই বলে দিব।

—তা যে যাই বলুক, আমার ভালো লাগ্যাছে মানুষটিকে। দেখছিলে না, কেমন কড়া কড়া কথা। জেহেলে উয়াকে কি আটকায় রাখতে পারবেক কেউ ?

সত্যিই, ওঁকে আটকে রাখার মত কয়েদখানা নেই। অন্তর কি স্বচ্ছ ! কি সুন্দর ব্যবহার। একটা দিনের ব্যবহারেই মুগ্ধ হয়ে গিয়েছে নবীন। চৈতন্যদেবের উল্লেখ করেছিল অজয়, চৈতন্যদেব আপনার রক্ত বইয়ে দিয়ে বলেছিলেন, মেরেছিস কলসীর কানা, ভালো করেছিস জগাই, তবু তোরা একবার নাম কর—বল, হরিবোল। জগাই-মাধাই বলেছিল, হরিবোল !

অজয়ও ত তাই—শুধু মার খেয়েছে নাকি। কলিয়ারীর খাদে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল একটা রাত, তবু আপনার পথ থেকে সরে আসেনি। বলেছিল নাকি, আজ যারা মারছে পরের দেওয়া কু-যুক্তির মদে মাতাল হয়ে এক দিন তারাই কাছে টেনে নিবে। কথা মিথ্যে হয়নি অজয়ের। অত বড়ো কলিয়ারীটার মানুষগুলো নাকি ওর কথাতেই উঠে বসে।

—তোমার ভালো লেগেছে বলেই আজ সেজেছ নাকি ভৈরবী ? জিজ্ঞেস করলো নবীন।

—না, এমনিতে ত তোমার চোখে পড়লাম না, তাই ভাবলাম, দেখি সাজ-পোষাক করে যদি তপস্যা ভাঙাতে পারি।

—আর ওই মালা ? উ-কি আমার জন্য ?

—ঠিক বলেছ। চলেই এসেছি ঘর ছাড়্যা। লোকে দুর্নাম দিয়েছে, সেই দুর্নামকেই মালা করেছি ওদের মুখ বন্ধ কৈরতে হৈলে একটা কাজ ত কৈরতে হবেক।

ভৈরবী আর কোনো কথা না বলে সাবধানে মালাটি খুলে নিয়ে অতি দ্রুত পরিয়ে দিল নবীনের গলায়।

—একী করলে ভৈরবী !

খিল খিল করে হেসে উঠলো ভৈরবী। ওর হাসি শুনে রাধা উঠে এলো বিছানা থেকে। ঘুম তার হয়নি, চুপ করে শুয়েছিল সন্ধ্যা থেকে।

পা টিপে টিপে এগিয়ে এসে নবীনের কুঠুরির দরজায় এসে দাঁড়ালো। দরজাটা ভেজানো ছিল—কিন্তু তার ফাঁক দিয়ে ভিতরের সমস্ত কিছুই নজরে পড়ছিল তার।

ভৈরবীর হাসিতে মাদকতা আছে। ফুলের মালা গলায় পড়তেই নবীনের বুকের ভিতরটা চঞ্চল হয়ে উঠলো। অবশ হয়ে এলো তার শরীর—চোখের উপর ভৈরবীর দেহটা তাকে টান দিল প্রবল আকর্ষণে।

—সত্যি তুমাকে সোন্দর লাগছে।

ভৈরবী জড়িয়ে ধরলো নবীনের হাত। আর আপনাকে সামলে রাখতে পারলো না নবীন, হারিয়ে গেলো সে, ভৈরবীর মায়াময়ী মূর্তি তাকে টেনে নিলো। সে টেনে নিলো ভৈরবীকে আপনার বুকের উপর।

ভৈরবী কোনো কথা কইলো না।

*　　　*　　　*　　　*

পরদিন ভোরে উঠেই বেরিয়ে গেলো নবীন। বড়ো অপবিত্র মনে হলো নিজেকে। গত কালের ঘটনাটা তাকে ক্রমাগত দংশন করে চলেছে। দেহের পীড়া সহ্য করা যায়, মনের পীড়া অসহ্য। ভুলতে পারলে তবে শান্তি পাওয়া যায়, জ্বালার উপশম ঘটে। কিন্তু ভুলবে কি করে নবীন? প্রাক সূর্যোদয় কালে আকাশের পানে তাকিয়ে একবার মনে মনে প্রণাম জানালো উষাকে, তার সঙ্গে আপনার গোঁসাইকে। তুমি ক্ষমা কর গোঁসাইজী! উষার অন্তরালে একখানি উজ্জ্বল নক্ষত্র হাসছে যেন,—সে যেন বলছে—তুই মানুষ নবীন। মানুষ হলেও—সে ত সহজ মানুষের জৈব ধর্মকে গ্রহণ করেনি। যৌন আকর্ষণ যে তার পক্ষে নিন্দার্হ। যৌন পিপাসাকে দূর করতে না পারলে যে সংসারের কোনো মঙ্গলই করতে পারবে না সে! মিথ্যা কথা। প্রকৃতি পুরুষকে টানবে, এই ত জাগতিক নিয়ম। এ নিয়ম বিধাতার সৃষ্টি। যৌন ব্যাভিচার মানুষকে নিক্ষেপ করে পঙ্কিল আবর্তে। সেখানে সেই অসহায় মানুষ হাবু ডুবু খায়, মৃত্যু এসে গ্রাস করে তাকে। ব্যাভিচারী ত নয় নবীন।

লোকালয় ছেড়ে জঙ্গলের দিকে গেলো নবীন। আপন খেয়ালেই খানিক ঘুরলো জঙ্গলটার মধ্যে। বিচিত্র জগৎ—বনভূমির শ্যামল

গাম্ভীর্যের মধ্যে একটা যেন মিশে আছে প্রশান্তি। তপ্ত অনুতপ্ত মন নিয়ে এখানে এসো—প্রকৃতি তোমাকে টেনে নিবে আপনার শান্তিময় পরিবেশের মধ্যে, তোমার মনে হৃদয়ে বুলিয়ে দিয়ে যাবে তার শীতল পরশ। শান্তি খুঁজে পাবে।

নবীনের সময়ের হিসাব ছিল না। সে বসেছিল একটা জায়গায়। প্রভাতী সূর্যের আলো এসে তাকে স্পর্শ করলো। চমক ভাঙলো তার। উঠে পড়লো নবীন। জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসতে দেখলো—সে প্রায় কালোপাথর কলিয়ারীর কাছে এসে গেছে। মনে পড়লো অজয়বাবুর কথা। বাবুটি যেতে বলেছিলেন নবীনকে। একবার যাওয়াই যাক না। সেই ভালো—সারাটা দিন কলিয়ারীতে কাটিয়ে দিয়ে সন্ধ্যায় ফিরবে নবীন। ওরা হয়ত ভাববে,—মালিনী খাবার করে বসে থাকবে, রাধা স্নানের যোগাড় করে রাখবে, তা রাখুক। ভাবুক ওরা—, ভৈরবী হয়ত—, না থাক।

হন্ হন্ করে এগিয়ে চললো নবীন। খানিকটা দূর এগিয়ে যেতেই চোখে পড়ল চরণ দাসের চায়ের দোকানটি। রাস্তার ধারে, একটি কাঠের ঘর। সাজানো গোছানো দোকান নয়। টিনের উনোনে চা করে—তেলে ভাজা ভাজে। একটা টিনের উপর লাল কাপড়ে ঢাকা থাকে পান। কাঠের দেয়ালের গায়ে সরু সরু তাকে সাজানো থাকে বিড়ি, সিগারেট, সিগারেটের বাক্স। অতি পুরোনো একটা কেলেণ্ডার। ছবিটার জন্যই কেলেণ্ডারটা ফেলে দেয়নি চরণ। ছবিটা এমন বিশেষ যে ভালো তা নয়—একটা মেয়ের অর্ধোলঙ্গ ছবি। চরণ নাকি কলিয়াবীতেই কি একটা কাজ করত, গত বারের হাঙ্গামায় চাকরি গেছে। কি আর করে—বাঁচতে হবে, বাঁচাতে হবে, তাই কিছু টাকা খরচ করে এই দোকানটা করেছে। এটাও যে স্থায়ী তা নয়। কোনো দিন আবার যদি হুকুম আসে—এখানে চরণের দোকান করা চলবে না, তবে উঠে যাবে, আর কোথাও।

চরণ চায়ের জল চড়িয়েছিল। চা হতে দেখে চায়ের জন্য তৃষ্ণা অনুভব করলো নবীন।

—বস হে বাউল, বস। চরণ নবীনকে দেখে বললো।

—তুমি না বল্লেও বসতাম। চা খাওয়াও দেখি।

চরণ চা করে দিল নবীনকে। চায়ের ছোট গ্লাসটা হাতে নিয়ে কয়েক চুমুক দিল নবীন।

—খদ্দের কই চরণ? জিজ্ঞেস করলো নবীন।

—আসবে এখুনি।

মাইকে একটা স্বর ভেসে এলো—কে সবাইকে জানিয়ে দিচ্ছে—সভা হবে এখানে। অজয়বাবু বক্তৃতা দিবেন, তার সঙ্গে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। কান পেতে শুনলো নবীন। মাইকে বলে চলেছে,—জৌলুষে সবাই সামিল হয়ে যাও।

চরণও শুনছিল চা করতে করতে। একটা বড়ো কেৎলিতে এক কেৎলি জল দিয়ে উনোনে চড়িয়ে দিতে দিতে বললো, ঐ আসছে সব। এখুনি এসেই চা চাইবে।

নবীন বললো, ওরা কারা চরণ?

—এই কলিয়ারীরই মানুষ। মিটিং হবে। হোক্ হোক্—। সরকার মাইনা ধার্য করে দিয়েছে, মালিক বলছে সরকারের রায় মানে না। কত লোক যে দিন মরছে খাদে তার ত হিসাবই নাই, আমি দশ বছর কাজ করেছি, তাও আমি নাকি পারমেণ্ট হইনি। মুখের বাঁধন যেন খুলে গেল চরণের। সে বলেই চললো, তার অতীত জীবনের নির্যাতনের কাহিনী।

কিছু তার বুঝলো নবীন, কিছু বুঝলো না। তবে এ-টুকু উপলব্ধি করলো যে এখানের মানুষরা সুখী নয়।

চা-টা খাওয়া হবার আগেই একটা ঘোড়ার গাড়ী এসে থামলো। গাড়ীর সামনে পতাকা লাগানো। উড়ছে ওটা। চালের উপর মাইকের স্পীকার।

গাড়ী থেকে নেমে এলো কয়জন।

—চরণ, চা দাও। একজন বললো।

—এই যে, তোমাদের জন্যই চড়িয়েছি। এবার তাহলে উঠে পড়ে লেগেছ? জিজ্ঞেস করলো চরণ।

ছোকরাটি বললো, জরুর। হাতটা মুষ্টিবদ্ধ করে সুর করে বললো, জোর জুলুম কা ঠোক্কর মে, হরতাল হামরা নারা হ্যায়।

চা খেয়ে চলে গেলো ওরা। যাবার সময় চরণকে মিটিংএর দিনে হাজির থাকতে বলে গেলো। নবীন তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলো ওদের। বেশ লাগলো—একটা প্রাণের স্বাভাবিক গতি যেন বাঁধন ভেঙে উদ্দামতায় এগিয়ে চলেছে। আহা, হা—

—ওরা কারা চরণ ?

—এখানেই কাজ করে।

কিসে যেন ওরা সামিল হতে বলে গেলো সবাইকে। জৌলুষ ! হ্যাঁ, তাই। কিন্তু কথাটা ত এর আগে শোনেনি। দেখেই যাবে ওটা। চা খাওয়া হয়ে গিয়েছিল—, একবার কলিয়ারীর চারিপাশটা দেখে আসতে ইচ্ছা হলো তার। উঠে পড়লো নবীন।

চারিপাশ ঘুরে যখন ফিরে এলো তখন বেলা অনেকটা হয়েছে। ক্ষিদে পেয়েছে নবীনের। সঙ্গে পয়সাও নাই তার। একবার ভাবলো চরণকে বলে গোটা কয়েক পয়সা ধার দিতে, এখানেই কোনো একটা দোকানে খেয়ে থেকে যাবে, পরক্ষণেই আবার মনে হলো—না, এ কাজ ঠিক হবে না। ফিরে যাওয়াই ভালো।

—আসি চরণ ?

—আরে থেকে যাও। জৌলুষ দেখে যাবে।

—আসব তখন।

—না হে না। থেকেই যাও।

সত্যিই গেলে আর আসা হবেনা। থেকেই গেলো নবীন। বিকেলের দিকে চরণ বললো, দোকান খোলা থাকল বাউল, তুমি দেখো—আমি চললুম।

উত্তরের কোনো অপেক্ষা না করেই চলে গেল চরণ। একটু পরেই একটা মোটা ভারী আওয়াজ ভেসে এলো। শব্দগুলো ঠিক বোঝা গেল না, তবে মনে হলো যেন হাজার মানুষ একই সাথে কি বলছে।

সে আওয়াজ এগিয়ে এলো কাছে। আরো কাছে। সামনেই দেখা গেলো পতাকার সারি ! এই বোধ হয় জৌলুষ—রাস্তার ধারে দাঁড়ালো নবীন। দীর্ঘ একটা মানুষের স্রোত যেন বয়ে গেল তার সামনে দিয়ে। প্রতিটি মুখ উজ্জ্বল। জনস্রোতে নাকি ঢেউ সৃষ্টি করে।

এত দিন কথাটা শুনেছিল নবীন। আজ চোখে দেখলো—ওদের মাথার উপর দিয়ে একটা ঢেউ উঠা-নামা করে চলেছে। বড়ো ভালো লাগলো নবীনের। কারণ জিজ্ঞেস করলে সঠিক ভাবে হয়ত বলতে পারবে না—কিন্তু মনে হলো একটা প্রাণ যেন জেগেছে—মৃত্যুঞ্জয় প্রাণ। কিন্তু একি! তার প্রাণেও আজ একি সাড়া দিচ্ছে—ওরাই মানুষ! ওদের কথাগুলো, নবীনের মনে তোলপাড় সৃষ্টি করছে—; কে যেন বলছে—পুরুষান্ন পরং। আঁকাশের তেজস্মান ভানুর কিরণের অনুতে অনুতে—ছড়িয়ে পড়ছে যেন গোঁসাইজীর সেই কথা, ন মনুষ্যাচ্ছেষ্ঠতরং হি কিঞ্চিৎ!

চোখ বন্ধ করলো নবীন। ওর গোঁসাইজীর বাণী, ওর গুরুর উপদেশ শুনতে পেলো চলমান ওই স্রোতের কলধ্বনির মধ্যে। ওরা বাঁচতে চায়, নালা—নদী মহানদীর স্রোতেও বাঁচতে চায় মহাসাগরের মাঝে, বাঁচতে হলে ত সংগ্রাম করেই বাঁচতে হবে। নবীনের কণ্ঠ থেকে কথার সঙ্গে সুর বেরিয়ে এলো—

বাঁচবি যদি, বাঁচ বাঁচার মত করে।

* * * *

—কি গো ছোট গুঁসাই, বলি আখড়া বলে মনে পড়লো। নবীন ঢুকতেই প্রশ্ন করলো মালিনী।

নবীন আখড়ায় এসে যখন পা দিলো, তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। সত্যিই—খুব দেরী হয়ে গেছে তার। আরো আগে আসা উচিত ছিল!

—আমার জন্য তোমরা বসেছিলে নাকি? জিজ্ঞেস করলো নবীন।

—রাঁধা ভাত হাঁড়িতেই আছে। উত্তর দিলো মালিনী।

ছিঃ ছিঃ এ খুব অন্যায়, সে না হয় আসতে দেরীই করেছে, তার জন্য এ সব বাড়াবাড়ি করা কেন?

—তোমরা কেউই খাওনি?

—তোমাকে রাখ্যা খায় কেমন কৈরে। যাও হাত-মুখ ধুয়ে আইস্যে খাত্যা বৈস। কই লো রাধা, জল দে ছোট গুঁসাইকে। আর বল, চন্দ্রাবলীকে—তার কিষ্ট ঠাকুর ফিরেছে। এবারে উঠুক।

রাধা দড়ি বালতি নিয়ে এসে কুয়ো থেকে জল তুলে দিল। ভিতর থেকে এনে দিল গামছা।

—সেই যে তুমি গেলে—তখন থাক্যাই শুয়ে আছে ভৈরবী, অত কইলাম, চন্দ্রা উঠ, উঠে খা—তা কি শুনে ? শুধু কাঁদে, বলে, "দিদি আমার জন্যই চলে গেলো মানুষটা।"

চমকে উঠলো নবীন। কিন্তু আর কিছু বললো না।

মালিনী বললো, আমি বরং বললাম, আসুক ফিরে তখন ঝগড়া করিস। যাই বল ছোট গুঁসাই, আমি আর সামলাতে লারব। ইবারে কুথাও গেলে ইয়াদিকে লিয়েই যাইও সাথে করে। একজন মনে মনে কাঁদে, একজন অভিমান করে শুয়ে থাকে।

যদি আরো জল তুলে দিতে হয়, তারই জন্য মালিনীর গা ঘেঁসে দাঁড়িয়েছিল রাধা। মালিনীর কথার জবাবে বললো চুপি চুপি, আমার বয়েই গেইছে কাঁদতে !

—থাক লো থাক—কথা বলিস না। আমার ত চোখ নাই—আমি দেখতে পাই না ! যা খাত্যা দিবি।

ভৈরবী তখনো শুয়ে আছে। নবীন এসেছে—ভৈরবী উঠে আসার কোনো লক্ষণ দেখালো না। মালিনী তুলে দিতে গেলো ভৈরবীকে।

—ইবারে মুখ তুল চন্দ্রাবলী !

না, কিসের জন্য মুখ তুলবে। সে চায়না মুখ দেখাতে।

—চল খাবি চারটি।

—আমার খিদা নাই দিদি।

—সারা দিন খাস নাই, আর বলছিস খিদা নাই, আয় উঠতেই হবেক।

জোর করে তুলে নিয়ে এলো ভৈরবীকে। ভৈরবী চারটি মুখে দিয়ে আবার গিয়ে বসলো আপনার কুঠুরিতে। মাথাটা তার বিগড়ে গেছে। নানা ভাবনা এলো-মেলো ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কোনোটাই আর স্থায়ী ভাবে বসছে না। একটা অশান্তি—তাকে চঞ্চল করে দিয়েছে।

শুয়ে পড়েছে সবাই। রাত্রি হয়েছে। আখড়ার বাইরে কিছু দেখা

যায় না। কোথায় কয়েকটা কুকুর অযথা চীৎকার করে মরছে। রাত্রির নিস্তব্ধতা ওদের চীৎকারে ভীতি উদ্রেক করে। যেন একটা বিপদ চুপি চুপি এগিয়ে আসছে অন্ধকারে আত্মগোপন করে।

বিছানা থেকে উঠে বসলো ভৈরবী। পাশে ঘুমুচ্ছে মালিনী। জোরে জোরে নিঃশ্বাস পড়ছে। না—ঘুমিয়ে গিয়েছে ওরা। বাইরে এলো ভৈরবী। উঠানে এসে দাঁড়ালো—অন্ধকারের মধ্যে ওই কলিয়ারীর নানা রঙের আলো তারার মত জ্বলছে। খানিক সেই দিক পানেই তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো ভৈরবী। ভুলতে চেষ্টা করলো—তার মনোবেদনা। ওই অন্ধকারের মাঝে কে যেন দাঁড়িয়ে থেকে বলছে, ভুল কচ্ছিস ভৈরবী! চলে যেতে চাইছিস এখান থেকে—কিন্তু যাবি কোথায়? ভৈরবী তাকালো কলিয়ারীর ওই ছোট্ট আলোগুলোর দিকে, সেখান থেকে ওরা বলছে, আমরা আছি ভৈরবী। —খবরদার ওখানে যাবিনা ভৈরবী—আমি জানি ওখানে কি হয়। আমার বুকে পা দিয়ে ওখানের এক শ্রেণীর মানুষ কারবার করে। আমি দেখি, শিউরে উঠি, আঁৎকে উঠি ওদের কাণ্ড দেখে। তাও কিছু বলতে পারি না। মনে আছে ভৈরবী, তোদের গাঁয়ের কুসমির কথা?

—মনে আছে বৈকী। খাদে চাকরী করত সে। এক সাহেবের কুঠিতে কাজ করত—খাদে পড়ে মরে গেইছে।

—ভুল কথা, মিথ্যা কথা ভৈরবী,—কাজ করত কামিনের। রূপ ছিল, যৌবন ছিল তার। সেই রূপ আর যৌবনে নজর পড়ল স্মিথ সাহেবের। আয়ার কাজ দিল সাহেব। পোষাক দিল—অর্থ দিল। ভুলে গেলো কুসমি। সাহেবের ভালোবাসা পাবার জন্য কলিয়ারীর কতো মানুষ ত হাঁ করে থাকে, সেই ভালোবাসা পেলো কুসমি। তারপর একদিন কুসমির দেহে দেখা গেলো মাতৃত্বের লক্ষণ। সাহেবকে জানালো কুসমি, তার স্বামী আছে, তার সমাজ আছে। এ সব কথা জানলে সমাজে যে তাকে নিবে না, তাই সাহেবকে বললো অনুনয় করে, একটা উপায় করতে। উপায় করেছিল সাহেব—গভীর রাত্রে আমারই চোখের সামনে সাহেব চালালো বন্দুক। তারপর চুপি চুপি নিয়ে এসে ফেলে দিল ওই খাদে। কেউ জানে না, আমি জানি।

ডুকরে উঠলো ভৈরবী। দূরের বিজলী বাতি মিট্ মিট্ করে যেন বলছে, ও সব বিশ্বাস করবি না ভৈরবী। তুই চলে আয়।

অন্ধকার বললো, না, ভালোবেসে দুঃখ পা, তাও ভালো, চোখের জলে বান ডাকা, তাও আনন্দ পাবি। তুই ফিরে যা ভৈরবী। ফিরে যা।

আস্তে আস্তে ফিরেই এলো ভৈরবী। আসতে আসতে দেখলো নবীনের ঘরে আলো জ্বলছে।

সাবধানে দরজা খুলে ভিতরে ঢুকলো ভৈরবী। নিঃশব্দে গিয়ে দাঁড়ালো নবীনের পিছনে। নবীন জানতে পারলো না। গভীর মনোনিবেশ সহকারে একটা কাগজের উপর কি লিখছিল নবীন। প্রদীপের স্তিমিত আলোয়। আলো আঁধারী পরিবেশে একটা মায়ার সৃষ্টি করেছিল ঘরখানায়। ধ্যান ভাঙাতে ইচ্ছা হলো না ভৈরবীর। একবার ভাবলো ফিরে। যেমন চুপি চুপি এসেছিল, তেমনি নিঃশব্দেই বেরিয়ে যাবে সে, কিন্তু পরক্ষণেই মন থেকে কে যেন বললো, না যাবি কেন? যে কাজের জন্য এসেছিস, তাই শেষ করে নে। তুই ত শুধু নিঃস্বার্থ সেবা করবার জন্য এখানে আসিসনি ভৈরবী, তুই যে ভালোবেসে এসেছিস। নিজের ছায়াটা দেখে নিজেই চমকে উঠলো ভৈরবী ওই ছায়াই যেন এতক্ষণ শাসাচ্ছিল। তার বুকে মাতৃত্বের ক্ষুধা, তার মনে অতৃপ্ত বাসনা। নড়ে উঠলো আপনার ছায়াটা।

—রাত ঢের হ'য়্যাছে কিষ্ট ঠাকুর।

চমকে উঠলো নবীন। হাতের কলম রেখে পিছন ফিরে তাকালো।

—এখনো তুমি জেগে আছো ভৈরবী!

—ক্যানে জাগে আছি তাই জানতে চাইছ, না কৈফিয়ৎ চাইছ?

—ও দুটোর একটাও নয়। বরং আশ্চর্য হচ্ছি। এত রাত জাগলে অসুখও ত হতে পারে।

—পারে বৈকী, হৈলে ত একা আমার হবেক নাই, তুমারও হবেক। ভৈরবী আরো একটু এগিয়ে এলো।

নবীন মনোনিবেশ করলো তার লেখায়। আরো একটু প্রশ্রয় দিলে, আরো কাছে এগিয়ে আসবে ভৈরবী, কাজ নেই তাতে।

—একটি কথা শুধাব কিষ্ট ঠাকুর ? ভৈরবী এসে সামনে দাঁড়ালো।

—কি ?

—সত্যি বলবে ?

—মিথ্যা কখনো ত বলিনি।

—আচ্ছা সত্যি বলতো, তুমি মানুষকে ভালোবাস ?

প্রশ্ন শুনে অবাক হয়ে গেলো নবীন। ভৈরবীর মুখে এত বড়ো দার্শনিক প্রশ্ন! কি উত্তর দিবে সে? প্রথমটায় কোন জবাব না দিয়ে শুধু তাকিয়ে থাকলো ভৈরবীর মুখের পানে।

—কি চাইছ যে ?

—হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন ভৈরবী !

—একটু বৈসতে দিবে—দূরেই বৈসব।

একটুখানি জায়গা ছেড়ে দিল নবীন। ভৈরবী স্পর্শ বাঁচিয়ে বসলো।

—আমি ভালোবাস্তে ঘর ছাড়েছি—ঘর, আপনার জন সবাইকে ছাড়্যা আস্যাছি, আর তুমি ?

—এ সব কি বলছ ভৈরবী ? আমি কাকেও ঘৃণা করি না।

—মিছা কথা কইছ কিষ্ট ঠাকুর।

—কিসে বুঝলে ?

—তুমি ঘরে থাক না, পালাঞ পালাঞ ঘুরে বেড়াও, সে কিসের তরে ? আমি আছি বলেই না।

—এ ভুল ধারণা ভৈরবী। একজন মানুষ থেকে – সকল মানুষের মঙ্গলের জন্যই আমাদের বাউলদের জীবন। নিজের স্বার্থকেই যদি বড়ো করে দেখবো ভৈরবী, তাহলে ত আমরাও সংসারীই হতে পারতাম। আমাদের সাধনা সবাইকে নিয়ে।

আজ দেখেছে নবীন। হাজার হাজার মানুষ কেমন করে একটি সত্তায় পরিণত হয়। একরূপ, এক আত্মা, এক কথা—, চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতে পারত না নবীন। এক বহু হয়—ওই অজয়বাবু, বহু হয়ে গেছেন। সবাইএর অন্তরে অজয়বাবু আছেন, তাঁর ইঙ্গিতে একটি বিরাট মানব গোষ্ঠী পরিচালিত হচ্ছে; আবার ওই হাজার হাজার

মানুষ—একটি অখণ্ডরূপে বিরাজ করছে। শক্তি তাদের অসীম। দেখলে শ্রদ্ধা জাগে, বিস্ময় জাগে, ভালোবাসতে মন চায়।

ভৈরবী বুঝলো না নবীনের কথা।

—বুঝলম নাই তুমার কথা। বললো ভৈরবী।

—অন্যদিন বুঝিয়ে দিব। আজ রাত্রি হয়েছে।

—না আজকেই বলতে হবেক। বল তুমি। ঘিন্না কর ত সইতে পারি, কিন্তুক অবহেলা কর ত সইব না।

—আমি ঘৃণাও করি না, অবহেলাও করি না। কিন্তু তুমি যা চাও তা আমি দিতে পারবো না ভৈরবী।

ভৈরবীর মুখখানা ম্লান হয়ে গেলো। তার ক্ষুধা আছে, কিন্তু সে ক্ষুধাকে চেপে রাখবে ভৈরবী। কিন্তু আজ আর ফিরে যাবার পথ নেই। সে থাকতে চায় এখানে—ওই নবীনের কাছেই। আজ চলেই যাচ্ছিল—কিন্তু পারেনি। অন্ধকার থেকে—কে যেন ঠেলে দিয়েছিল তাকে—বলেছিল, ফিরে যা ভৈরবী, ভালোবেসে যদি কাঁদতে হয় তাও ভালো। কান্নাই পাচ্ছিল তার।

সে অকস্মাৎ নবীনের হাত দুটি দৃঢ় ভাবে ধরে বললো, সংসার আমি চাই না কিষ্ট ঠাকুর, আমি চাই তুমাকে।

—আমাকে চাইলে আমার আদর্শকে গ্রহণ করো ভৈরবী। আমি যা করি তাই করো, সুখ পাবে।

—কিসে সুখ পাবো জানি না। বলে দাও কি কৈরব! কাতরতায় ভরা ভৈরবীর কণ্ঠস্বর।

নবীনের অন্তরকে স্পর্শ করলো ভৈরবীর আবেদন। সে বললো, বলে দিব, কিন্তু আজ যাও শোও গে। ধরে উঠিয়ে দিল নবীন।

যে অশ্রুকে এতক্ষণ জোর করে আটকে রেখেছিল ভৈরবী, এখন তাই ঝরে পড়লো।

রাত প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। বাইরের অন্ধকার পাতলা হয়ে গেছে। দূরের গাছগাছালির গায়ের উত্তরীয় তখনো আছে জড়িয়ে। শেষ করেছে গানটা নবীন। আজ গাইবে—অজয়বাবু বলেছেন। আজ সভায় নিজের করা গান গাইবে নবীন। মনে পড়লো অর্জ্জুনকে।

অনেক দিন কোনো খবর পায়নি। আজ সভায় যখন গাইবে তখন অর্জুন পাশে থাকলে সব থেকে খুশি হতো সে—একবার খবরটা দিয়ে আনানো যায় না! দূর ত বেশী নয়—কয়েকটা ইষ্টিশন পরেই। যাবার মত মানুষ আছে মালিনী। তাকেই বলে দেখবে। একটু পরেই বেরিয়ে এলো নবীন! রাধা বাইরের দরজায় গোবর মাতুলী দিয়ে ফিরছিল। নবীনকে দেখে এক পাশে সরে দাঁড়ালো।

—তুমি ত অনেক সকালে উঠেছ রাধারাণী। বললো নবীন।

—ই কাজট আমাকেই করতে হয় যে! জল তুলে দিব?

—দাও। মালিনী উঠেছে?

—না। তুলে দিব দিদিকে?

—না থাক।

রাধা জল তুলে দিল। বেশ ভালো করে স্নান করলো নবীন। তারপর গৈরিক আলখাল্লাটা গলিয়ে নিলো গায়ে। কোমরে বাঁধলো ডুগিটি, হাতে নিলো একতারা। একবার গোঁসাইজীকে প্রণাম করে বেরিয়ে এলো নবীন।

—আজ এত সকালেই কুথায় চল্লে—ছোট গুঁসাই! মালিনী উঠেছে।

—এই যে মালিনী। আজ একটা বড়ো বায়না আছে। আমি চলি, বিরাট বড়ো আসর—হাজার হাজার লোক থাকবে। উৎসাহ নিয়ে বললেও, মালিনীর কাছ থেকে কোনো উৎসাহ পেলো না নবীন। ইদানীং ছোট গুঁসাইএর কেমন ভাবান্তর লক্ষ্য করেছে মালিনী। বড় গোঁসাই আখড়ায় গৌরাঙ্গদেবকে প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। বড়ো গোঁসাই থাকতে প্রত্যহ সকাল সন্ধ্যা ভোগ আরতি হতো ঠাকুরের। দোল, ঝুলন আরো সব উৎসব হতো। বাইরের থেকে বাউল বোষ্টম আসত—গান হতো, বাজার বসতো,—এখন আর কিছুই হয় না। ঘরের প্রতিষ্ঠিত ঠাকুর উপবাসে থাকেন। নবীনের এদিকে কোনো আগ্রহই দেখা যায় না, প্রথম প্রথম নবীনের এই অবহেলাকে সহ্য করেছিল, কিন্তু যতই দিন চলে যাচ্ছে, ততই কেমন অধৈর্য্য হয়ে উঠছে মালিনী। স্থির করেছিল, একদিন খুলেই বলবে নবীনকে—যে এ সব ভালো নয়;

—ছোট গুঁসাই, একটা কথা বলি মনে কিছু করোনা।

--মনে আবার করবো কি! বল কি বলবে।

—বলি, আখড়ার ঠাকুর কি উপাসেই থাকবেন? মালিনীর কণ্ঠস্বর আগের মত সরস নয়,—কেমন যেন কটকটে।

নবীন মৃদু হেসে উত্তর দিল, উপবাসী যাতে না থাকতে হয় তারই ব্যবস্থা করতেই ত যাচ্ছি মালিনী। আমি আসি, বেলা হয়ে গেলে ওঁরা আবার ব্যস্ত হয়ে উঠবেন।

নবীন মনে করেছিল মালিনীকে পাঠিয়ে অর্জ্জুনকে নিয়ে আসবে, কিন্তু মালিনীর মেজাজ দেখে আর সে কথা বলার সাহস তার হলো না।

বেরিয়ে গেলো নবীন।

কলিয়ারীর কাছাকাছি গিয়ে থমকে দাঁড়ালো নবীন। এক নূতন দৃশ্য তার দৃষ্টিগোচর হলো, সে দৃশ্য থেকে চোখ ফেরাতে পারলো না নবীন! প্রাকৃতিক শোভা দেখেছে নবীন, সৃষ্টির কাজে নন্দদুলালদের মগ্ন থাকতে দেখেছে—ঠাকুরের কাছে আরতি উৎসব দেখেছে, কিন্তু এমন বিস্ময় আর আনন্দ সঞ্চারী দৃশ্য দেখেনি নবীন! চারিদিক থেকে সার-বন্দী লোক চলেছে কালোপাথর কলিয়ারীর দিকে, মনে পড়লো বহুকাল আগের দেখা একটা দৃশ্য। বড়ো গোঁসাইএর সঙ্গে গান গাইতে গিয়েছিল নবীন একটা গ্রামে। সময়টা ছিল বর্ষাকাল। গানের আসর হয়েছিল জমিদারের লক্ষ্মী মেলায়। গান স্থরু হবে এমন সময় সংবাদ এলো বড়ো পুকুরটা ভেঙে গিয়ে চারদিক দিয়ে জল আর তার সঙ্গে মাছ বেরিয়ে যাচ্ছে। গ্রামের চাষীরাও অস্থির হয়ে পড়লো—পুকুরের নীচেই যাদের জমি তারা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লো—হায়, হায়—সর্বনাশ হয়ে গেলো তাদের। শষ্য ভরা ক্ষেত ধুয়ে মুছে নিয়ে যাচ্ছে পুকুরের জলে।

সবাই ছুটলো সেই দিকে, তাদের সঙ্গে নবীনও গেলো। একটু দূরে দাঁড়িয়ে দেখলো পুকুরের বন্ধ জল—আর জলের চাপ সহ্য করতে না পেরে চারিদিক দিয়ে হু-হু করে বেরিয়ে যাচ্ছে। ফাটল ধরে গেছে শক্ত পারে! এও যেন, তেমনি ভাবেই বেরিয়ে এসেছে বন্দী মানুষগুলি। তেমনি উদ্দাম স্রোত—তেমনি অবিভক্ত ধারা! কতোক্ষণ এমনি ভাবে

দাঁড়িয়েছিল নবীন তা ঠিক বলতে পারে না—আরো খানিক হয়ত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই জনস্রোত দেখতো, যদি না একজন পথচারী নবীনকে বলত, যাবে নাকি বাউল ?

—তোমরা চল্লে নাকি ? জিজ্ঞেস করলো নবীন।

—হাঁ। চলতে চলতেই উত্তর দিল মানুষটি। তার দাঁড়াবার সময় নেই—যেন মেলা দেখতে যাচ্ছে। দেরী হলে ভালো জায়গায় গিয়ে বসতে পাবে না।

নবীন অনুসরণ করলো মানুষটিকে। চরণের দোকানের কাছে এসে দেখলো—দোকান বন্ধ। টিনের উনোনটা পড়ে আছে রাস্তার ধারে। কোথায় গেলো তবে চরণ ? কাকেও যে জিজ্ঞেস করবে তারও উপায় নেই। আজ যেন অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে উঠেছে কলিয়ারীটা। কেউ যে দাঁড়িয়ে ওর কথার জবাব দিবে তা তাদের অবসর নেই। একটা যান্ত্রিক শব্দ কানে এলো নবীনের। কে সবাইকে ডাক দিয়ে বলছে—"আমরা চাই মানুষের মত বেঁচে থাকতে। আমরা চাই আমাদের জীবন ধারণের উপযোগী মজুরী। এ দাবী অস্বাভাবিক নয়, অন্যায় নয়—" না নয়—নিশ্চয় অন্যায় নয়—নবীনের মনও ওই কথাই বলছে, বাঁচার মত মজুরী না পেলে বাঁচবে কি করে ?

মিটিংএর কাজ আরম্ভ হয়ে গেছে তবে। অজয় বাবু তাকে আসতে বলেছিলেন—গান গাইবে নবান, হাজার হাজার মানুষের প্রাণে আপনার ভাবনাকে ছড়িয়ে দিবে।

নবীন এগিয়ে গেলো সভার জায়গায়।

যে চলমান ধারাকে দেখেছিল রাস্তায়—এখানে এসে দেখলো সেই সব জনস্রোত—এখানে—এই ময়দানে স্থির হয়ে বিরাজ করছে। এদের মাঝে পথ করে এগিয়ে যাবার রাস্তা করতে না পেরে দাঁড়িয়ে থাকলো নবীন।

মাইকের সামনে এক জন দাঁড়িয়ে সবাইকে শান্ত হতে বললো, —আমরা শুধু মার-ই খেয়ে চলেছি, অন্ধকার খনি গর্তে যে অসহনীয় জ্বালা আমাদিকে সইতে হয়—তার পরিচয় কয়জন জানে ? আমরা সেই কথাটাই জানাতে চাই সকলকে—

নবীন শুনতে শুনতে কেমন বিমনা হয়ে গিয়েছিল--তার ভাবুক মনে সুরের ঢেউ খেলে গিয়েছিল, মনে মনে গাইছিল—সেদিনের সেই গানটা —বাঁচবি যদি, বাঁচ বাঁচার মত করে। এমনি সময় এক জন এসে বললো, অজয় বাবু ডাকছেন। কোথায় উনি? ও'র আমন্ত্রণেই ত নবীন এসেছে এই খানে। গান শুনতে চেয়েছিলেন অজয় বাবু। গান শোনাবে—আজ।

—এসো। নবীন এসে উঠলো ডায়াসের উপরে, ঠিক মাইকের সামনেই অজয় বাবু বসালেন নবীনকে।

—কেমন লাগছে বাউল? জিজ্ঞেস করলেন অজয় বাবু।

—মানুষের সমুদ্র দেখলাম বাবু। উত্তর দিল নবীন।

—কেমন স্থির, না?

—হাঁ।

—সমুদ্রকে ফুলতে দেখেছ বাউল?

—না।

ঠিক এই সময়েই সভায় একটা চাঞ্চল্য দেখা দিলো। যারা বসেছিল, তাঁদের মধ্যে অনেকে উঠে দাঁড়ালো। এক জন এসে অজয় বাবুর কানে কানে কি কথা বলে গেলো। অজয় বাবু বললেন, সভা আমাদের হবেই। শান্ত থাকতে বলো সবাইকে।

— আমি বলি বাবু? বললো নবীন।

এত বড়ো আসর—জীবনে পাবেনা নবীন। নবীনকে ত ওরাই বাঁচিয়ে রেখেছে—, ওদের ভালো হোক্, এ-ত শুধু ওদেরই কাম্য নয়—এ যে নবীনেরও কাম্য।

অজয় বাবু বললেন, সেই ভালো। বল বাউল। ওরা যেন ভয় না পায়। বাঁচবার দাবী নিয়ে ওরা এসেছে—পালিয়ে গেলে,ভয় পেলে চলবে কেন? নবীন উঠে দাঁড়ালো মাইকের সামনে। হাতে ওর একতারা। একতারার তার ঝংকৃত হলো—, সেই ঝংকারে সুর মিলালো নবীন—

ওরে বাঁচবি যদি
বাঁচ বাঁচার মত করে
মরণ সে ত হবেই হবে
কি হবে মরার আগে মরে॥

স্তব্ধ হয়ে গেলো জমায়েত, নবীনের কণ্ঠে ধ্বনিত হলো —

এই যে দুঃখ এই যে অত্যাচার
এ নহে অদৃষ্ট লিপি, নয় বিধান বিধাতার।
ওরে, এই পৃথিবীর আলো হাওয়ার,
এই মাটিতে ফসল পাওয়ার
তোরও আছে সম অধিকার
প্রতিষ্ঠা কর তারে ॥

আনন্দে আর উত্তেজনায় ফেটে পড়লো জমায়েত, হারিয়ে গেলো নবীন। ওর সঙ্গীত শোনা গেল সকলের কণ্ঠে, সবাই বললো, 'বাঁচ বাঁচার মত করে।'

* * * *

অজয় আপনার গলা থেকে মালাখানি খুলে পরিয়ে দিল নবীনের গলায়। হাজার হাজার মানুষ করতালি দিয়ে সম্বর্দ্ধনা জানালো। অভিভূত হয়ে গেলো নবীন। মনের কথা আর মুখ দিয়ে বেরুলো না। সে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলো মানুষগুলির দিকে।

—কি দেখছ বাউল ? জিজ্ঞেস করলো অজয়।

—দেখছি—।

এর বেশী বলার হয়ত প্রয়োজনও ছিল না। আজ যা দেখছে, এ দৃশ্য তার কাছে নূতন। যা শুনছে—সে কথাও নূতন।

—ওরা খুব খুশি হয়েছে বাবু।

—ওরা যে তোমার আপনার লোক বাউল। ওদের মনের কথাটি আজ তুমি যে ওদের শুনিয়ে দিলে, তাই ওরা এত আনন্দিত। বাঁচার মত ক'রে—বাঁচতে চেষ্টা করি না বলেই ত আমাদের সইতে হয় অশেষ দুঃখ অনেক যন্ত্রণা।

সপ্রশ্ন দৃষ্টি মেলে তাকালো নবীন। সে আরো কিছু জানতে চায় যেন।

অজয় বললো, তোমার আখড়ায় এক দিন যাবো নবীন।

কৃতার্থ হয়ে গেলো নবীন। অন্তরে আনন্দের ঢেউ উঠলো। বললো, আসবেন, নিশ্চয়ই আসবেন।

আট

—মালিনী, ও মালিনী ! পর দিন অতি ভোরে ফিরে এলো নবীন।

রাধা ঠাকুরের পূজোর জন্য ফুল তুলছিল, সেই প্রথম দেখলো নবীনকে, গলায় ফুলের মালা, হাতে একতারা—আহা, সত্যই এক অপরূপ সৌন্দর্য নবীনকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। এক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল রাধা নবীনের দিকে।

—মালিনী কই, রাধা ? জিজ্ঞেস করলো নবীন।

—ঠাকুর ঘরে গোবর দিচ্ছে। ডাকব ?

—না থাক।

ফুলের সাজি নিয়ে নবীনের সামনে এসে দাঁড়ালো রাধা। তখন সবে মাত্র সূর্যোদয় হয়েছে। আকাশের রক্তিম আভা এসে পড়েছে নবীনের আখড়ার ছোট্ট বাগানটির মালতী লতার গায়ে। লতাটির গা ঘেঁসেই দাঁড়িয়েছিল রাধা। রাধাকেও আজ দেখাচ্ছে সুন্দর। একটি স্নিগ্ধ ভাব পরিব্যাপ্ত ওর মুখ-মণ্ডলে। তাকিয়ে দেখছিল নবীন। এমন ক'রে আগে কোনো দিন দেখেনি রাধাকে। রাধা সুন্দরী। রাধা উপর দিকে তাকাতেই মুহূর্তের জন্য দৃষ্টি বিনিময় হয়ে গেলো নবীনের সঙ্গে। রাঙা হয়ে উঠলো রাধার মুখখানি। আস্তে আস্তে বললো, চন্দ্রা দিদিকে উঠাঞ দিগা !

—ভৈরবী এখনো ঘুমুচ্ছে বুঝি ?

—হাঁ, কাল রাতে সারা রাত মাথার যন্ত্রণায় ছটফট করেছে—ঘুমায় নাই।

—ওঃ, তুমি এগুলো নিয়ে যাও। গলা থেকে মালাটি খুলতে যাবে এমনি সময়েই মালিনী এসে উপস্থিত হলো। হাতে তখনো গোময় লেগে রয়েছে।

—দাঁড়াও ছোট গুঁসাই, দেখি কেমন সাজ্যাছ। মালিনী এসে দাঁড়ালো নবীনের সামনে।···আহা কিবা মানাঞছে রে। মাথায় শিখিপুচ্ছ কই ছোট গুঁসাই ? এমন করে কে সাজাঞ দিলেক গো।

—এ আমার জয়মাল্য মালিনী।

—তাই নাকি ? কপাল ভাঙলো লো রাধা, চন্দ্রাকে বল—কপাল যে তুদের ভাঙলো। আবার কোন্ রমণীর মন জয় করে আইলে ছোট গুঁসাই !

—চল সব কথাই বলবো। গলার মালা ও একতারাটি রাধার হাতে দিয়ে দিলো নবীন।

রাধা নিয়ে গিয়ে রাখলো একতারাটি নবীনের ঘরে। মালাটি কোথায় রাখবে তাই সমস্যা। একবার মালাটি বুকের কাছে জড়িয়ে ধরলো, একবার ঘ্রাণ নিলো। তারপর কি মনে হলো,— সেই মালাটি আপনার গলায় পরে নিলো রাধা। একখানা বড়ো আর্শি থাকলে দেখত, কেমন মানিয়েছে।

নবীন পরম উৎসাহে গত দিনের সভার বিবরণ দিচ্ছিল মালিনীকে। মালিনী সব শুনে বললো, যাই হোক ছোট গুঁসাই, আমি ভাই ভালোই বলছি—রাতে আখড়া ছাড়া তুমার চলবেক নাই। মালিনীর গলার সুরে সে রকম রস নেই। ওই কটি কথার মধ্যে একটা যেন অনিশ্চিত আশংকার ইঙ্গিত রয়েছে।

নবীন বললো, এ কথা কেন বলছ মালিনী।

—আমি না হয় বুড়ী মানুষ—কিন্তু আর দুটি ? দুষ্টু লোকের কি অভাব আছে সংসারে ?

একটা নোতুন কথা। এ কথা কোনো দিনই চিন্তা করেনি নবীন। তাদের যে কেউ অমঙ্গল করতে পারে তা ভাবতেও পারে না। নবীনকে চিন্তিত দেখালো খানিকটা।

মালিনী আবার পরিহাস করেই বললো, তুমার সংসার সামলানো আমার কাজ লয় ছোট গুঁসাই। কাল সারারাত আলে নাই, তা এক জন মাথার বেদনায় ছটফট করলো, আর এক জন বুকের বেদনায়। ওলো ও চন্দ্রাবলী, বলি এবার উঠ। ওলো ফিরে এসেছে তোদের কানাই! ইয়ার পর উয়াদিকে সাথ করেই লিয়ে যেও বাপু।

—তাই করবো। অন্যমনস্ক ভাবেই উত্তর দিল নবীন।

—তুমি বস ছোট গুঁসাই, আমি হাতের কাজ শেষ কৈরে আসি। তারপর ত আবার ভিক্ষায় বিরাতে হবেক।

—এখন কয়দিন চলে যাবে মালিনী !

—কিসে চলবেক ? আখড়ায় যে ক্ষুদ কুড়াও নাই।

নবীন কাপড়ের খুঁট থেকে দুটো দশ টাকার নোট বের করে মালিনীর হাতে দিল।

—কে দিল গো ছোট গুঁসাই।

—অজয় বাবু।

অজয় বাবুর সঙ্গে পরিচয় নেই মালিনীর। একবার মাত্র দেখেছে এই আখড়ায়।

—বাবুটি ভালো লোক ত ! দুঃখু বুঝেন।

—উনি আসবেন মালিনী। বলেছেন, আখড়ায় গিয়ে তোমার সঙ্গে আলাপ করবো বাউল। ওরা আবার চা খান।

একটু বেলাতেই ঘুম ভাঙলো ভৈরবীর। মালিনীর তখন ঘরসংসারের কাজ সারা হয়ে গিয়েছে। নবীন সকাল সকাল স্নান ক'রে আপনার ঘরে বসে কয়েকটা চটি বইএর পাতা উল্টাচ্ছে। দেখে নিচ্ছে একবার—বইগুলো আসবার সময় অজয় বাবু দিয়েছেন পড়তে। পড়বে নবীন।

ভৈরবীকে দেখেই মালিনী বললো, ওলো ঘরের মানুষ ফিরে আস্যাছে, পারিস ত আঁচলে বাঁধ্যা রাখিস। ভৈরবী কোনো জবাব দিলনা। মুখে তখনো জল দেয়নি ভৈরবী, তাই মুখ হাত ধোবার জন্য চলে গেলো বাইরে। মুখ হাত ধুয়ে ফিরবার সময় কানে এলো একটি মিষ্ট স্বর। কে যেন গাইছে—জনম অবধি হম ওরূপ নেহারলু, নয়ন না তিরপিত ভেল, লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়া বাখলু, তবু হিয়া জুড়ন না গেল—গানের কথা ও সুর আকৃষ্ট করলো ভৈরবীকে। কে গাইছে ? গলাটা যেন চেনা চেনা মনে হলো তার।

—কি গো দিদি মাথার বেদনা সারল ?

রান্নার জন্য জ্বালানী সংগ্রহ করছিল রাধা। আখড়ার পিছনেই ছোট্ট যে তরকারীর বাগান করেছে ভৈরবী, সেই খানেই শুকনো কাঠ কিছু পড়েছিল, তাই আনতে গিয়েছিল সে। রাধার কথার কোনো জবাবই দিলনা ভৈরবী। জবাব দিতে ইচ্ছা হলো না তার। রাধার প্রশ্নর সঙ্গে যেন একটুখানি শ্লেষ মিশে রয়েছে।

—তুমার তরে চা করে রাখ্যাছি দিদি, খায়্যা লিও। আবার বললো রাধা।

—তুমরা খায়্যাছ ত ?

—হাঁ।

একবার ইচ্ছা হলো জিজ্ঞেস করে—তুগাদের ছোট গুঁসাই খায়্যাছে ? কিন্তু পরক্ষণেই কি মনে করে আর কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলো না সে।

—ছোট গুঁসাইএর সাথে দেখা হৈল তুমার দিদি ? জিজ্ঞেস করলো রাধা।

—না। গম্ভীর ভাবে উত্তর দিল ভৈরবী।

—আহা, সে যদি দেখতে দিদি ছোট গুঁসাইকে, গলায় ফুলের মালা, হাতে একতারা, চূড়া করে বাঁধা চুল, কী সুন্দরই দেখাছিল দিদি, ঠিক তুমার কিষ্ট ঠাকুরটি।

—তাই বুঝি তুমি গান গাইছিলে ?

সত্যই তাই,—নবীনেরদৃষ্টির রশ্মি রাধার অন্তরকে গিয়ে স্পর্শ করে একটি সুপ্ত ভাবধারাকে জাগিয়ে দিয়েছিল। একটি অপূর্ব পুলক শিহরণ জেগে উঠেছিল তার সারা অঙ্গে। রাধা যেন নূতন ভাবে জন্ম নিলো। যে প্রেম, যে ভালোবাসার স্রোতধারা এত দিন রুদ্ধ ছিল, তাই যেন নির্ঝরের স্বপ্ন ভঙ্গের পর নানা ভঙ্গিমায় প্রবাহিত হতে চাইছে। তাকে রোধ করার শক্তি কই রাধার ?

—ঠিক বলেছ দিদি।

ভৈরবী এ উত্তর প্রত্যাশা করেনি। রাধার জবাব জ্বালা ধরিয়ে দিল ভৈরবীর অন্তরে। সে আর এক মুহূর্তও না দাঁড়িয়ে চলে গেলো। রাধা হাসলো একটু।

গভীর মনোযোগ দিয়ে অজয় বাবুর দেওয়া বইগুলি পড়ছিল নবীন। এতেও যেন সেই একই কথা লেখা আছে—পুরুষান্ন পরম্। গুরুদেবের কথা। পড়তে ভালোই লাগছিল তার। অজয় বাবু বলেছেন—এই বই পড়ে গান লিখতে হবে নবীনকে, সেই গান গাইতেও হবে। সুন্দর সুন্দর কথা লেখা আছে—জাতি কি ? কয়টি জাতি ? মানুষের দুরবস্থার কারণ। বইএর মধ্যে ডুবে গিয়েছিল নবীন।

—ওগো ছোট গুঁসাই, বলি সারাটা দিন কি বই পড়েই কাটাবে নাকি ? মালিনী এসে দাঁড়ালো দরজার সামনে।

—বল কি করতে হবে ? জিজ্ঞেস করলো নবীন।

—এখনো যে সব কাজই বাকী গো, ঠাকুরের আরতি, ভোগ—সে না হয় পরে হবেক, কিন্তু এখনি যে চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে যাত্যা হবেক ছোট গুঁসাই ?

—কেন ? ভৈরবীর অসুখ কি বেড়েছে ?

—একবার পরীক্ষা কৈরে দেখবে চল।

—তুমিই দেখলে নাই কেন ?

—দেখেছি।

মুখ হাত ধুয়ে এসেই ভৈরবী আবার শুয়েছিল আপনার পরিত্যক্ত শয্যায়। মালিনী অনেকক্ষণ তার অপেক্ষায় চায়ের বাটি, খাবারের থালা নিয়ে বসে থেকেও যখন এলো না ভৈরবী, তখন নিজে গিয়েছিল ডাকতে। ভৈরবী ওঠেনি। বলেছিল, শরীল ভালো নাই।

মালিনী বলেছিল, তাহলে কবরাজকে ডাক্যা আনি বল।

—না। উত্তর দিয়েছিল ভৈরবী।

—তাহলে খাবি চল্ লো।

—খিদা নাই।

—বুঝি লো বুঝি, ভালোবাসার বড়ো জ্বালা!

আকাশে মেঘ জমা হলেই জল হয়না, একটু হাওয়ার প্রয়োজন হয়। মালিনীর কথা-বায়ুর স্পর্শে ভৈরবীর অন্তরে জমে থাকা মেঘ হঠাৎ ঝরে পড়লো চোখ দিয়ে।

একি আচরণ করতে শুরু করেছে ভৈরবী! শুধু শুধু অশান্তিকে ডেকে আনার অর্থ কি ? সে এই জীবন ধারাকে গ্রহণ করতে পারে নি, যেখানে শুধু নিজেকে বিলিয়ে দেওয়াও আনন্দ, সেখানে ভৈরবী চায় নিজেকে আরো সংকুচিত করতে! সমস্ত সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে, আপনার দেহজ স্বার্থকেই সবার উপরে স্থান দিয়েছে ভৈরবী—আর এই আচরণকেই সমর্থন জানাতে হবে নবীনকে ?

—আমি এখন যেতে পারবো না মালিনী। বললো নবীন। হাসলো মালিনী।

—হাসলে যে— ?

—তুমার কথা শুনে ছোট গুঁসাই।

—কেন ?

—তুমি রাগ কৈরেছ ছোট গুঁসাই। কিন্তু রাগ তুমার সাজে না ভাই। তুমাকে ভালোবাসেই ঘর ছাড়্যাছে ভৈরবী, এ কথা ত ঠিক ?

নবীন জবাব দিলো না।

—কি, জবাব দিলে নাই যে! মান আর না মান, কথাটি ত খাঁটি সত্যি।

—এই কি ভালোবাসার লক্ষণ মালিনী ?

—বটে বইকি ভাই, মান-অভিমান আছে বলেই ত প্রেম এত মিষ্টি।

—ও যা চায় তা আমি কোনো দিনই দিতে পারবো না মালিনী।

—তবে উয়াকে না আনলেই পারতে! এখন ভালো মানুষের মত উঠ দেখি। কাছে যাঁয়্যা দাঁড়াও, কপালে হাত দিয়ে একবার বলে আইস, কিছু খায়্যা লিতে। কাল থাক্যা উপোসী আছে যে!

খানিক চিন্তা করে মালিনীর প্রস্তাবে রাজী হলো নবীন।

* * * *

সেদিনের কলিয়ারী মজুরদের জমায়েতে গান গাওয়ার পর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে নবীনের নাম। অনেক জায়গা থেকেই আমন্ত্রণ আসে—বায়না করতে আসে। যেখানে যেখানে যাওয়া সম্ভব যায় নবীন। সঙ্গে যায় রাধা। রাধার গলার সুর যেমন মিষ্টি, তাল-মানের জ্ঞানও ঠিক তেমনি। আসর জমে উঠে সেই গুণে।

মালিনী একদিন বলেছিল, ই তুমার কি রীতি ছোট গুঁসাই, এক জনকে রাখ্যা আরেক জনকে লিয়ে যাও। বসেছিল ভৈরবী। সে বলেছিল, আমি অমন তিলক কাট্যা ভেক্ ক'রে যাতে লারব দিদি।

—সে কী কথা কইছিস্ চন্দ্রাবলী, শ্রীরাধা শ্যামের অদর্শনে মরতে চায়্যা বলেছিল, "মরিলে তুলিয়ে রেখো তমালেরই ডালে, আমি তমাল

বড়ো ভালোবাসি। কৃষ্ণ কালো, তমাল কালো—তাইতে তমাল—" আর তুই তিলক পরতে লারবি ?

—উ ভেক আমার ভালো লাগেনা।

মুচকি হেসেছিল রাধা। সে আর থাকতে না পেরে বলেছিল—তার চায়্যা দিদিকে গন্ধ তেল্ল আর সাবান আন্যা দিও দিদি।

রেগে উঠেছিল ভৈরবী. কিন্তু কোনো জবাব না দিয়ে উঠে চলে গিয়েছিল। মালিনী রাধার গালে চিমটি কেটে বলেছিল. দিলি ত রাগাঞ্চ !

—আঃ রাগ !

রাধাও উঠে গিয়েছিল। হাতে তার কাজ ছিল পড়ে। ছোট গুঁসাইএর পরিধেয় বস্ত্রগুলো ময়লা হয়ে গিয়েছিল—সেগুলো পরিষ্কার ক'রে না দিলে, আর সেগুলো গায়ে দেওয়া যায় না। বাইরের পাঁচটা ভদ্র লোক আসে—তাদের সঙ্গে মিশতে হয়। বড়ো বড়ো আসরে গাইতে হয়—পোষাকটাও আসর মাফিক হওয়া চাই ত! রাধা উঠে গেলে মালিনী বলেছিল, ছোট গুঁসাই, আজ আবার তুমি বাইরে যাবে নাকি ?

—হাঁ।

—রাধাও যাবে ?

—গেলে ভালো হয়।

—ওকে রেখে বরং চন্দ্রাবলীকেই লিয়ে যাও। তুমি রাধাকে লিয়ে গাইতে যাও, ই-ট পছন্দ করে না চন্দ্রাবলী।

—না করলে আমি কি করতে পারি ! হাসলো নবীন।

—তুমি ত চন্দ্রাকে শিখাই লিতে পারো।

—সে আগ্রহ নেই ওর।

—দেখই না চেষ্টা করে।

মালিনীর কথাতেই সেদিন ভৈরবীকে ডেকেছিল নবীন। একটা বায়না এসেছে শহর থেকে। অজয় বাবু একটা চিঠি লিখে পাঠিয়েছেন—যেন বায়না গ্রহণ করে নবীন। তার সঙ্গে লিখেছেন—শহরে একটা সংস্কৃতি সম্মেলন হবে, অনেক দিক থেকে অনেক গুণী লোক আসবেন, শহরের মানুষও থাকবে, নিশ্চয় আসা চাই। চিঠিটি ডাকে না পাঠিয়ে

এক জনের হাতে পাঠিয়ে দিয়েছেন। তার সঙ্গে যাওয়ার রাহা খরচ আর আগাম কিছু টাকা।

এর আগে শহরের সুধী, সুসভ্য মানুষদের জমায়েতে কোনোদিন গায়নি নবীন, স্বভাবতই একই সঙ্গে আনন্দ এবং আশংকা তার মনের মধ্যে উঁকি দিচ্ছিল। পণ্ডিত, বিদ্বান মানুষের সমক্ষে তাকে দাঁড়িয়ে গাইতে হবে তত্ত্ব-কথা—, ভুল ত্রুটি থাকলে হাস্যাস্পদ হবে। লোকে হাসবে তার অজ্ঞতার পরিচয় পেয়ে। আনন্দ এই জন্য যে আজ শিল্পী হিসাবে স্বীকৃতি তার মিলেছে।

—আমি কি আপনাদের খুশি করতে পারবো বাবু। যে লোকটি অজয়ের চিঠি নিয়ে এসেছিল তাকে বললো নবীন।

—পারবেন বৈকী।

—সেখানের বড়ো বড়ো মানুষ—আর আমরা হলাম গাঁয়ের বাউল, আমাদের গান কি সেখানে জমবে ?

—শহরের মানুষ গাঁয়ের বাউলের গান শুনবার জন্য এখন হাঁ করে থাকে বাউল—, শহরে বাস করছে বলেই তাদের ভয় করবার কিছু নেই, আর তাদের বড়ো করে দেখবারও কিছু নেই।

—আচ্ছা আমি যাবো বাবু।

পত্রবাহক পকেট থেকে একখানি ছাপানো কাগজ বের করে নবীনের সামনে রেখে বললো, এই আমাদের প্রোগ্রাম। এতে আপনার নামও আছে। ছাপা অক্ষরে নাম উঠেছে নবীন বাউলের। বার কয়েক দেখল নামটা—, বড়ো বড়ো গায়কদের সঙ্গে তারও নামটা স্থান পেয়েছে। সম্মান রাখতে হবে।

—একটা নোতুন গান লিখেছি রাধা, এই গানটা রপ্ত করে নাও গাইতে হবে—শহরে গিয়ে। একতারাটি নিজে ধরলো নবীন। রাধা নিলো মন্দিরা, ভৈরবী বসে থাকল একপাশে।

—ভৈরবী তুমিও সঙ্গে সঙ্গে গাইবে। তোমাকেও নিয়ে যাবো এবার।

—আর গাইতে যদি না পারি? জিজ্ঞেস করলো ভৈরবী।

—পারবে না কেন ? চেষ্টা করলেই পারবে।

—তাল যদি কাট্যা যায় ?

মালিনী এই প্রসঙ্গে একটা উপাখ্যান বর্ণনা করলো। স্বর্গে দেবরাজ ইন্দ্রের সভায় কোন নর্তকীর তাল কেটে যাওয়ার জন্য তাকে অভিশপ্তা হতে হয়েছিল।

—আমারও সেই শাস্তি হবেক নাকি গো ? হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলো ভৈরবী।

—সে বিচার হবে পরে, নাও এখন ধর রাধা।

রাধা সুর করে গাইলো নবীনের নূতন রচনা—

এই দুনিয়ায় দুটি জাতি ভাই
একটি হলো "যাদের আছে"
অপরটি হয়—"যাদের নাই ॥"

নবীন বললো, গাও ভৈরবী—

যাদের আছে সে-জাতি কয়
"এই বিশ্ব মোদেরই হয়
ধরণীর এ ধন-দৌলতে
"যাদের নাই" এর
অধিকার নাই ॥

নয়

—ওহে বাউল, বাউল আছ!

বাইরে থেকে পরিচিত একটি ডাক ভেসে এলো ভৈরবীর কানে।

মালিনীর আজ দিন কয়েক হলো শরীর ভালো নেই। তিন জনকেই শহরে নিয়ে যেতে চেয়েছিল নবীন; মালিনী যায়নি। বলেছিল, সবাই চলে গেলে আখড়া কে দেখবেক ছোট গুঁসাই ? তার চেয়ে তোমরাই যাও—আমি থাকি। একলা মালিনীকে রাখতে চায়নি নবীন। একটি মেয়ে মানুষকে একলা রেখে যাবেই বা কি করে! কিন্তু মালিনী যখন বলেছিল, ঘরে ঠাকুর আছেন ছোট গুঁসাই, সেবা ত করা চাই। তুমি রাধা আর চন্দ্রাকে নিয়ে যাও ।

তাই হয়েছিল। ফিরতে দিন কয়েক দেরী হয়েছিল নবীনের। অজয়বাবু ছাড়েন নি। বলেছিলেন, যখন এসেছ বাউল, তখন কিছু টাকা রোজগার করে যাও। শহরে আরো কয়েক জায়গায় বায়না ধরাতেই দেরী হয়ে গিয়েছিল ফিরতে। ফিরে যখন এলো, তখন দেখলো মালিনী শয্যাশায়ী। আজো গায়ে বেশ জ্বর রয়েছে তার। নিজে কিছু করতে পারে না,—তাই ইচ্ছা করেই আখড়া দেখা-শোনার ভার দিয়েছে ভৈরবীর উপর। শাড়ীর খুঁট থেকে চাবির গোছাটা খুলে ভৈরবীর হাতে দিয়ে বলেছিল, বাক্স প্যাঁটরা ত কিছু নাই, ঘর দুয়ার আছে, তবু চাবি তুই রাখ চন্দ্রা। আর ছোট গুঁসাই টাকা পয়সা দিলে তাই রাখিস, খরচ করিস।

—তার তরে ত রাধা আছে দিদি!

—ওলো, সব কাজ কি সব লোকে করতে পারে! তুই যে সংসারী মানুষ, তুর মনে যে সংসার বাঁধবার কামনা, তুর চোখে-মুখে যে ভোগের আকাংখা। তুই-ই পারবি লো—বাউলের সংসার চালাতে তুই-ই পারবি। ভৈরবী বসেছিল মালিনীর পাশেই।

মালিনীর কথাগুলি তীব্র হলেও সত্যি। সত্যিই ত সে ভোগ করতেই এসেছিল। সে চেয়েছিল জীবনকে সুখী করতে,—কিন্তু ঠাকুরকে ভালো লেগেছিল ভৈরবীর তাই এসেছিল তার কাছে। কিন্তু পেল কই তাকে? মালিনীর কথায় রাগ করতে পারলো না ভৈরবী। সে আস্তে আস্তে বললো, আমি তুমাদের মতন হৈতে লারব দিদি। সেবাদাসী হ্যা আখড়ায় থাকতে লারব।

—তবে কি করবি?

—বলে দাও দিদি, কি করবো বলে দাও। এমনি সময়েই বাইরের থেকে পরিচিত গলার আওয়াজ শুনে বেরিয়ে এলো ভৈরবী।

—ওমা অজ্জুন দাদা যে গো!

—হঁ, আইলুম। অনেক দিন কুনু খবরই পাই নাই বাউলের। তাই ভাবলুম একবার দেখে আসি।

—বেশ কৈরেছ। উঠে আইস। অর্জ্জুনকে বসতে দিলো ভৈরবী। এসে খবরটা দিলো মালিনীকে।

মালিনী বললো, কুটুম মানুষ, যত্ন করিস চন্দ্রা। মান্য করিস।

—আঃ তুমার এক কথা দিদি। কুটুম কিসের ?

হাত-পা ধোবার জল তুলে দিয়ে, চা করে দিলো ভৈরবী। তারপর নিজেই তার কাছে এসে বসলো।—কি মনে কৈরে আইলে অর্জ্জুন দাদা।

—দেখতে আইলুম কেমন আছিস তুরা। তা ভাল আছিস ভৈরবী ?

—কেমন দেখছ ?

—উপর-ট ত ভালো দেখাছে নাই, মনের কথা কি কৈরে জানব বল। আর বাউল কুথায় ?

আস্তে আস্তে উঠে এলো মালিনী।

—কি গো সখী ভালো আছ ভাই ? জিজ্ঞেস করলো অর্জ্জুন।

—এত দিন ত ভালোই ছিলুম, কিন্তু গৌরাঙ্গ আর ভালো রাখছেন কই ? তুমার খবর ভালো।

—ভালো। আর আরেকটিকে দেখছি নাই যে! কি নাম যেন—

—রাধা আর বাউল গেইছে বাইরে। এখন কি আর সেই বাউল আছে হে। এখন তার কত নাম। আখড়ায় আর থাকে কখন !

কথাটা তবে সত্যিই বটে।

সেদিন ইষ্টিশনের মাষ্টারবাবু অর্জ্জুনকে ডেকে বলেছিলেন, 'ওহে অর্জ্জুন, তোমাদের গ্রামের সেই নবীন বাউলের নাম উঠেছে খবরের কাগজে। ছবিও বেরিয়েছে।' মাষ্টারবাবু খবরের কাগজের ছবিটা অর্জ্জুনকে দেখিয়ে দিয়েছিলেন আর যে অংশে নবীন বাউলের সংবাদটা ছাপা হয়েছে—সেই অংশটুকু পড়ে শুনিয়ে দিয়েছিলেন। আগ্রহভরে শুনেছিল অর্জ্জুন। বুকখানা আনন্দে আর গর্বে উঠেছিল ভরে। সে কাগজটা চেয়ে নিয়ে দেখিয়েছিল হরিদাদাকে। হরিদাদা বলেছিল, একবার তুদের গাঁয়ের লোকদের দেখাইছিস অর্জ্জুন—দেখুক সবাই। নবীন বাউল আর মামুলি লোক নয়। তাই করেছিল অর্জ্জুন। সবাইকে—জনে জনে ছবিটা দেখিয়ে আপনার কাছে রেখে দিয়েছিল কাগজটা। সেই কাগজটা নিয়েই এসেছে অর্জ্জুন। অন্য কোনো কাজ নেই—সে যে আনন্দিত হয়েছে, খুশি হয়েছে তাই জানাবে।

—কই কাগজটা দেখি ভাই সখা। বললো মালিনী।

পকেট থেকে যত্ন করে-রাখা খবরের কাগজের টুকরোটা বের করে দেখালো অর্জ্জুন। ঝুঁকে পড়ে দেখলো মালিনী। —একতারা নিয়ে গান গাইছে নবীন ; পাশে বসে আছে রাধা, তারই পাশে ভৈরবী।

—এই ত লো চন্দ্রাবলী, তুরও ছবি উঠেছে।

খুব একটা উৎসাহ দেখা গেলোনা ভৈরবীর। সে কাজের অছিলায় চলে গেলো বাইরে।

সকালটা কাটলো। দুপুরে যত্ন করেই খাওয়ালো ভৈরবী অর্জ্জুনকে। কাছে বসে থাকলো মালিনী। খাওয়া হয়ে যাবার পর খাটিয়া পেতে দিল ভৈরবী।

—আজ ত থাকছ অজ্‌জুন দাদা ? জিজ্ঞেস করলো ভৈরবী।

অর্জ্জুনের থাকবার উপায় নেই। মাষ্টারবাবুকে বলে কয়ে একটা দিনের ছুটি নিয়ে এসেছে, রাত্রে ফিরে যেতে পারলে কালকে আবার ডিউটি করতে পারবে—তাই বললো, থাকবার জো নাই যে।

—ওমা সে কী, বাউলের সাথে দেখা কৈরে যাবে নাই ? জিজ্ঞেস করলো মালিনী।

—বড়ো মানুষের দেখা কি সব সময় মিলে! আসব আবার।

—তাই কি হয়—আজকার রাতটা থাক্যা যাও। রাতে ঠিক ফিরে আসবেক ছোট গুঁসাই।

বিকেলের দিকে সত্য সত্যই ফিরে এলো নবীন। অনেক দিন পর অর্জ্জুনকে দেখে জড়িয়ে ধরলো আপনার বুকের মাঝে।

—এত দিন পরে তাহলে মনে পড়েছে অর্জ্জুন ভাই!

নবীন যতবার কলিয়ারীর মজুরদের সামনে গিয়ে গেয়েছে ততবারই মনে পড়েছে অর্জ্জুনকে। কেন—তা বলতে পারে না নবীন, কিন্তু প্রাণ তার চেয়েছে—এদের সঙ্গে অর্জ্জুন যদি থাকত! আজ তাই অর্জ্জুনকে পেয়ে আনন্দের সীমা নেই তার।

—কি হে বাউল, আজ-কাল তুমি নাকি আর আখড়াতেই থাক না। বললো অর্জ্জুন।

—থাকতে দিলে কই তোমরা ?

কথাটার অর্থ উপলব্ধি করতে পারলো না অর্জ্জুন, তাই জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলো।

নবীন বললো, মালিনী রাগ করে—আখড়ায় বিগ্রহের ঠিক মত পূজো হয় না—আরতি হয় না, উৎসব হয় না। আমিও মানি, কিন্তু কি করবো বল—যতবার, যতদিন গেছি ঠাকুরের সামনে, ততবার ততদিন—ঠাকুরের মুখে দেখেছি বিষণ্নতার ছাপ। খুঁজে পাইনি আমার মনের ঠাকুরকে। মন ব্যথায় ছুমড়ে এসেছে—কান্নায় চোখ ভরে গেছে—তারপর একদিন প্রভু দেখা দিলেন কালোপাথরের এক প্রান্তরে। ঠাকুর আমার হাজার হাজার হয়ে এসে দাঁড়ালেন আমার সামনে। আবিষ্কার করলাম ঠাকুর আমার—মাঠে, প্রান্তরে, ক্ষেতে খামারে, কারখানায়। বলতে বলতে ভাবাবেগে চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়লো নবীনের। এমন ভাবাবেগ কোনোদিন দেখেনি কেউ। সে দিনটা অর্জ্জুনকে আটকে রাখলো নবীন। অনেক কথা আছে তাকে বলবার, সে সব কথা আজ বলবে। সন্ধ্যায় আপনার ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালো অর্জ্জুনকে।

নবীনের ঘরে ছড়িয়ে আছে নানা রকম বই। এক পাশে একটি লণ্ঠন। লণ্ঠনের কাঁচটি অপরিষ্কৃত, দেখলেই মনে হয়—এটিতে বহুদিন কারো হাত পড়েনি। এক পাশে দড়ির একটা আলনা—সেই আলনায় কয়েকটা কাপড়। একটা নামাবলী এক পাশে অনাদৃত হয়ে পড়ে আছে। বই-পত্রগুলো সরিয়ে বসবার জায়গা করে দিল অর্জ্জুনের।

—ইঠ্যানে কেমন আছ বাউল? চল একবার গাঁয়ের দিকে।

—এখন আব অবসর কই অর্জ্জুন ভাই।

অর্জ্জুন আরো কিছু জানতে চাইলো। ভৈরবীর কথা, তার নিজের কথা।

সবই বললো, নবীন। এতোদিন যা হাতড়ে বেড়িয়েছে নবীন, তাই আজ পেয়েছে—গোঁসাই বলেছিলেন—বাউলের একটিই মন্ত্র—সে হলো "পুরুষান্ন পরম্"। মানুষ থেকে শ্রেষ্ঠ আর কেউ নেই। এই সত্যকে অবলম্বন করেই একদিন এই পথে সে পা দিয়েছিল—আজ সেই সত্যকে আপনার সাধনায় প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে নবীন। প্রসঙ্গক্রমে

কলিয়ারীর মজুরদের কথা উল্লেখ করলো নবীন। তাদের সংগ্রামের কথা—মানুষ হয়ে বেঁচে থাকবার আগ্রহের কথা। তাদের ধর্মঘটের কথা। তারই সঙ্গে নির্যাতনের কাহিনী।

শুনতে শুনতে উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল অর্জ্জুন। —কি বল্লে, পাঁচ পাঁচটা লোককে একেবারে জখম কৈরে দিলেক, আর কিছু করতে পারলেক নাই মালকাটারা? জবাব না দিয়ে হাসলো নবীন। ওই হাসির মধ্যেই ছিল অর্জ্জুনের কথার জবাব। এমনি সময়েই ভৈরবী এসে দাঁড়ালো দরজায়। —কি গো কিষ্ট ঠাকুর ভিতরে যাবো? নবীন বললো, আসবে বৈকী।

ভিতরে এলো ভৈরবী।

—দিদি শুধালেক—রাধা কি ওই ঠ্যানেই রইলো?

নবীন বললো, হাঁ।

—কেনে, রাখ্যা দিয়ে আইলে ক্যানে? সে কী আমার তরে নাকি?

প্রকৃতপক্ষে নবীন গিয়েছিল গাইতে। জলসার আয়োজন করেছিল কালোপাথরের মজুররা। তাদের ফণ্ডে কিছু টাকা চাই। কিন্তু এমন যে একটা অনর্থ ঘটবে তা কেউ ভাবতেও পারেনি। জখম মানুষগুলিকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে, বাড়ীর মেয়ে-ছেলেরা কাঁদতে থাকলে রাধা নিজেই বলেছিল, আজ আমি এই খানেই থাকি বাউল, যদি অনুমতি দাও। 'না' করেনি নবীন।

—না, রাধা নিজেই থেকে গেলো।

কাজ-ট ভালো কর নাই কিষ্ট ঠাকুর। কি গো অর্জ্জন দাদা তুমিই বল না! কাজ-ট কি ভালো হুঁয়্যাছে? অর্জ্জুন চুপ করেই থাকলো।

—রাত ত হুঁয়্যাছে, বলি তুমরা কি গপ্‌পই করবে?

—তুমি যাও, আমরা যাছি। বললো নবীন।

—গোপন কথা আছে নাকি কিষ্ট ঠাকুর?

—আমাদের আর গোপন কথা কি, চলো চল্লাম।

ভৈরবী বেরিয়ে গেলে, নবীন বললো, ভৈরবীর কথা জানতে চাইছিলে নয়?

—হাঁ হে, আমার যেমন কেমন কেমন মনে হৈছে। বললো অর্জ্জুন।

—ভৈরবীর এ জীবন নয় অর্জ্জুন ভাই। সে ভুল করেছে। তার অন্তরে মাতৃত্বের ক্ষুধা। সে ক্ষুধা মেটাবার ত আমার শক্তি নেই। পার যদি ওকে ফিরিয়ে নিয়ে যাও ভাই।

রাত্রিতে আর ঘুমুতে পারলো না ভৈরবী। শয্যায় যেন কে বিছুটি মাখিয়ে দিয়েছে। খানিক এ-পাশ ওপাশ করলো—, তারপর উঠে বসে থাকলো বিছানায়। রাধাকে কলিয়ারীতে রেখে দেওয়ার পিছনেও নিশ্চয় কোনো উদ্দেশ্য আছে নবীনের। সে চায়—ভৈরবীর কাছ থেকে রাধাকে সরিয়ে নিয়ে যাও, তারপর—ভাবতে পারলো না ভৈরবী! রাধা, রাধা, রাধা,—রাধা থেকে কোন বিষয়ে ছোট ভৈরবী? রূপ কি রাধারই আছে—ভৈরবীর কি রূপ নেই? যৌবন? একবার আপনার দেহটায় অন্ধকারেই হাত বুলিয়ে নিলো ভৈরবী। তবু কেন এই অবহেলা? ভৈরবী চেষ্টা করেছে এ আশ্রমিক জীবন গ্রহণ করবার, পারেনি। রস-কলি টানতে গিয়ে মনে হয়েছে, তার স্বাভাবিক সৌন্দর্যকে যেন সে মুছে দিচ্ছে। ঠাকুর ঘরে গিয়ে বসলে—মনে হয়েছে, নিজেকে বঞ্চনা করতে এসেছে। নবীনের সঙ্গে গান গাইতে গিয়ে থেমে গেছে—শুধু কি দিয়েই যাবে সে, তার পরিবর্তে কি পাওনা কিছু নেই। বিমল আনন্দ—, সে কথা বোঝে না ভৈরবী। সে যা চায়, সেই পাওয়াই ত তাই আনন্দ।

বাইরে একটা রাতচোরা পাখী শব্দ করে উড়ে গেলো—, কলিয়ারী সাইডিং থেকে ভেসে এলো একটা ইঞ্জিনের আওয়াজ। সে উঠে পড়লো চুপি চুপি! পা টিপে টিপে এগিয়ে গেলো—নবীনের ঘরের দিকে। সে আজ স্পষ্ট করে বলবে, আমার দেহ তুমি নাও,—আমাকে মুক্তি দাও।

নবীনের দরজায় এসে উঁকি মেরে দেখলো ভৈরবী। অকাতরে ঘুমুচ্ছে অর্জ্জুন। আর নবীন জেগে কি পড়ছে। হঠাৎ দরজায় একটু শব্দ হতেই, নবীন বললো, কে? ভাবলো, চলে যাবে নাকি! না যাবে না—সে এগিয়ে এলো।

—আমি।

—এখনো তুমি ঘুমোও নি ?

—চেষ্টা করলুম, আইলো নাই। তুমার সাথ কথা আছে, আসবে একবার।

বাইরে এলো নবীন।

—একটু বাইরে চল। মালতী লতার কাছে। কিছু বুঝলো না নবীন। বাধাও দিল না। প্রশ্নও করলো না।

মালতী লতার পাশে এসে দাঁড়ালো ওরা হু'জনে, আকাশের চাঁদ ডুবে গেছে, ভোরের শুকতারা দেখা দিয়েছে পূর্ব গগনে, একটু হিমেল হাওয়া বইতে স্বুরু করেছে।

—কি বলতে চাও ভৈরবী ?

ভৈরবী কোনো কথা না বলে, জড়িয়ে ধরলো নবীনের হাত ছুটিকে, আমাকে বাঁচাও।

—নিজেও তুমি ছুঃখ পাচ্ছ ভৈরবী। আমার জীবন, তোমার জীবন নয়। বরং তুমি ফিরে যাও ভৈরবী।

—না, তা হয় না। আমাকে তুমি একবার টান্যা লাও—আমি যে তুমাকে ভালোবাসে ঘর ছাড়্যাছি, মরদ ছাড়্যাছি! ভৈরবী জড়িয়ে ধরলো নবীনকে। নবীন বাধা দিল না—আকাশের শুকতারা অত্যন্ত উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিল—।

—এবার শোও গিয়ে ভৈরবী, বাইরে পাখী ডাকছে।

পরদিন সকালে উঠেই চলে গেলো অর্জ্জুন। যাবার সময় আবার আমন্ত্রণ করে গেলো নবীনকে। যাবার সময় ওর কাছ থেকে খবরের কাগজের টুকরোটা চেয়ে নিলো ভৈরবী।

নবীনও বেরিয়ে যাবার জন্য তৈরী হলো। একবার হাসপাতালে গিয়ে মানুষগুলোর খবর আনতে হবে। এ সময় অজয় বাবু থাকলে ওদের বল ভরসা থাকতো—কিন্তু আগেই সরিয়ে দিয়েছে তাকে। নূতন একজন কে নেতা এসেছে, কিছু লোক নাকি তার দলে গিয়েছে—নানা ছুঃসংবাদ। নবীন প্রস্তুত হলো।

ভৈরবী একখানা শাড়ী পরলো রাধার।

—কি লো তুই-ই যাবি নাকি ? জিজ্ঞেস করলো মালিনী।

—রাধা কাল থাইক্যা আসে নাই যে ! বললো ভৈরবী।

—জলদি করে ফিরিস কিন্তুক।

কলিয়ারী অঞ্চলে যখন গিয়ে পৌছালো তখন বেশ বেলা হয়েছে। চরণের চায়ের দোকানটা বন্ধ হয়ে গেছে। তারই পাশে একটা অশথ গাছের নীচে দাঁড়িয়ে ছিল কয়েকজন। ওদের সঙ্গেই ছিল গোবর্দ্ধন।

নবীনকে দেখে গোবর্দ্ধন বললো, এসো বাউল। আমরা তোমার অপেক্ষাতেই আছি।

—কেন গো ? হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলো নবীন।

—গান শুনবো।

নবীন নমস্কার করে বললো, ভাগ্য আমার।

নবীন বসলো অশথ গাছের নীচের পড়ে থাকা পাথরটায়।

একটা বিড়ি এগিয়ে দিল গোবর্দ্ধন।

একজন বললো, তোমার সেই গানটা বাউল, ওই যে—'বাঁচ বাঁচার মত করে—, আবার শুনবো বাউল।

—গানটা তবে মনে ধরেছে আপনাদের !

—ও যে আমাদেরই মনের কথা বাউল !

—তোমাদের নিয়েই যে আমি গো ! গোঁসাই বলতেন, মানুষ ভগবান। মানুষ আছে, তাই ত ভগবান আছেন। মানুষ কাঁদলে ভগবান কাঁদেন। আবার মানুষের গায়ে হাত পড়লে যে ভগবানের শরীরেই মারের দাগ ফুটে। তাই বলি বাঁচলেই হবে না—বাঁচার মত বাঁচতে হবে বৈকী

বাউলের হাতের একতারার তারে সুর উঠলো, সেই সুরের সঙ্গে সুর মিলিয়ে বাউল গাইলো—

ওরে বাঁচবি যদি, বাঁচ
বাঁচার মত করে
ওরে মরণ ত সে হবেই হবে
কি হবে মরার আগে মরে।
বাঁচ বাঁচার মত করে॥

নবীনের দরদ-ভরা কণ্ঠে সঙ্গীত যেন রূপ নিয়ে দাঁড়ালো সকলের সামনে। সে মূর্তি যেন আহ্বান জানালো সবাইকে। নবীনের সাথে সাথে সবাই গেয়ে উঠলো—ওই একই সঙ্গীত।

এই পর্যন্ত বলেই চুপ করে গেলো ভিখারিণী। একবার চোখ দুটো বন্ধ করে হয়তো অতীতকে স্মরণ করলো। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তারপর? ভৈরবী তারপর?

—তারপর? তারপর আর ত জানিনা বাবু; হাজার হাজার মানুষের সঙ্গে মিশে গেলো আমার কিষ্ট ঠাকুর, খুঁজে ত পাইনা।

———